KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007/ | Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত |
| Title : সমকালীন. (SAMAKALIN) | Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৪/- ৪/- ৪/- ৪/- | Year of Publication : কার্তিক, ১৩৬৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ পৌষ, ১৩৬৩ ফাল্গুন, ১৩৬৩ |
| | Condition : Brittle / Good |
| Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd No. C3597 Phone : 23-5155 -8/- SAMAKALIN

# সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

: সম্পাদক :
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত :

চতুর্থ বর্ষ ফাল্গুন ১৩৬৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# সমকালীন

## ॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্থ বর্ষ | ফাল্গুন | ১৩৬৩

**প্রবন্ধ**

প্রাচীন ভারতে কৃষিবিদ্যা : নলিনীকান্ত চক্রবর্তী ৬১৭
হ্যারল্ড লাস্কির রাষ্ট্রদর্শন : জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত ৬৩২
আদিম মানুষ ও শিল্পকর্ম : নিখিল বিশ্বাস ৬৪৪

**কবিতা**

আবিষ্কার : উৎপলা মুখোপাধ্যায় ৬২৩
অনেক দিনের শেষে : শিবেন চট্টোপাধ্যায় ৬২৪
পরবাসী মন : গোপাল ভৌমিক ৬২৫

**গল্প**

মুখোস : প্রকাশ পাল ৬২৭

**উপন্যাস**

এক ছিল কন্যা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩৬

**আলোচনা**

পাঠকের চোখে—সাম্প্রতিক পুস্তক সমালোচনা : পবিত্র পাল ৬৫১

**সমাজসমস্যা**

বাঙালীর পরিচ্ছদ ( ২ ) : অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৬৫৫

**সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ**

সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়-চিত্রপ্রদর্শনী : চিত্রিতা বিশ্বাস ৬৫৯

**গ্রন্থপরিচয়**

বনশ্রী ( অশনি মজুমদার ) : হীরেন বসু ৬৬১
বি-কেলাস ( অতীন্দ্রনাথ বসু : সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬২
বাংলার স্ত্রী আচার ( ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ) : সরিৎশেখর মজুমদার ৬৬২

সমকালীন
চতুর্থ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৬৩

# প্রাচীন ভারতে কৃষিবিদ্যা

## নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

ভারতবর্ষে কৃষিবিদ্যার আরম্ভ ও প্রসারের ইতিহাসকে পৃথিবীর যে কোন জাতীয় জীবনে গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করা যায়। সমসাময়িক কোন জাতির মধ্যে কৃষিবিদ্যায় এরূপ প্রসার দেখা যায় না। উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রত্নতত্বের গবেষণা ও আবিষ্কৃত তথ্য হতে জানা যায় যে উত্তর আফ্রিকা, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপোটমিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষ জুড়ে যে বাঁকা চাঁদের মত ভূখণ্ড তাতেই প্রথম কৃষিকার্য্যের আবিষ্কার হয়। সিন্ধুনদ বিধৌত উপত্যকা অঞ্চল তখনকার কৃষকের স্বর্গ ছিল। তাই সেখানে গড়ে উঠেছিল মাহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার সভ্যতা।

প্রাথমিক শস্যোৎপাদন শিক্ষা মানুষ বোধহয় প্রকৃতির কাছেই পেয়েছিল। আদিম যুগে ইতর প্রাণীর মতই মানুষ ফল মূল ও কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত, ক্রমে বংশ বৃদ্ধির ফলে আহার্য্যের অভাব ঘটতে থাকে। আদিম মানুষ তখন নিজেদের পরিবার নিয়ে যাযাবর অবস্থায় অনেক দুরবর্তী স্থানে গিয়ে শস্যোৎপাদন করতে বাধ্য হয়। খাবার উপযোগী নানা ধরণের বনজ গাছের বীজের অঙ্কুরোদ্গাম ও পরিপূর্ণতা লাভের সময় ইত্যাদি লক্ষ্য করে তারা শস্য সমূহের বপন ও কর্ত্তন কাল ঠিক করত, ঐ যুগে কৃষিকার্য্যের জন্য জমির অভাব হত না। প্রথম অবস্থায় তারা বন জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে পরিষ্কার করে চাষ করা ছাড়াই ঐ জমিতে শস্যোৎপাদন করত, বর্ত্তমান যুগেও আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে ( ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ) প্রাচীন অনুন্নত ধরণের কৃষি প্রণালী ( জুম চাষ ) প্রচলিত আছে।

মানুষ ক্রমে ক্রমে সভ্য হয়ে ঘর বাড়ী বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করে। তারা খাদ্যদ্রব্যের জন্য রোজ রোজ বনে বনে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করার হাঙ্গামা হতে রক্ষা পেতে বাড়ীর কাছে কাছে গাছ পালা লাগাতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে চাষবাসের যন্ত্রপাতিও তৈরী হয়।

খাদ্য শস্যের মধ্যে বোধহয় গম ও বালির চাষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চারহাজার বছরেরও আগে চীন দেশেই বোধহয় প্রথম বালি ও গমের চাষ আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে গম চাষের প্রচলন বোধহয় চীন দেশ হতেই হয়েছে, ধানের চাষ গম বালির কিছু পরে। তবে ইহার চাষও যে

প্রাগৈতিহাসিক তাহাতে সন্দেহ নাই, সম্ভবতঃ ( Stuart Piggotএর মতে ) ভারতবর্ষেই প্রথম ইহার চাষ আরম্ভ হয়।

বৈদিক যুগের অনেক পূর্ব্ব হতেই ভারতের মানুষের সঙ্গে গাছপালার সম্বন্ধের নিদর্শন পাওয়া যায়। নব্যপ্রস্তর যুগেই মানুষ তার ভবঘুরে স্বভাব ছেড়ে ঘরবাড়ী বেঁধে থাকতে আরম্ভ করে, তারা চাষ ইত্যাদি দ্বারা শস্য উৎপাদন করে নিজেদের আহারের যোগাড় করত, ভারতবর্ষে নব্য-প্রস্তর যুগের কৃষিকার্য্যের প্রমাণ বেলুচিস্থানের রাণা ঘু-ডাই টেল ( Rana Ghundi Tell ) হতে পাওয়া গিয়েছে, এখানে একদল নিওলিথিক কৃষিজীবির তৎপরতার কয়েকটি চিহ্ন খনন কার্য্য দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছে। সে যুগের মানুষের চাষবাষ করে খাওয়ার এক প্রমাণ শস্যপেষণের যন্ত্রপাতি। সেখানকার ছাইগাদা হতে আবিষ্কৃত খড়ও তাদের কৃষিকার্য্যের প্রমাণ দেয়। বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত কৃষিজীবিদের তৎপরতা প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মত প্রাচীন নয়, সম্ভবতঃ নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশ হতে কৃষিবিদ্যা ভারতে প্রবেশ করে। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে কাপড় পরারও প্রচলন ছিল।

লৌহযুগের আবিষ্কার হতে বুঝা যায় তখনকার মানুষ উন্নত ধরণের চাষবাস আরম্ভ করেছিল। তাদের কবর খুঁড়ে ধান, চানা ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে, তারা সুতা কাটত ও কাপড় বুনত। অর্থাৎ তাদের মধ্যে তুলার চাষও ছিল, আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ হাজার বছর আগেকার সিন্ধু উপত্যকাও অন্যান্য স্থানে তুলার চাষ আরম্ভ হয়।

নব্যপ্রস্তর যুগের এক হাজার বৎসরের পরের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ হাজার বছর আগেকার ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাই সিন্ধুতীরের মাহেঞ্জোদারো হরপ্পা খুঁড়ে। এই দুই স্থানে যে সব যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছে তা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ হাজার অব্দের অনুরূপ সময়ে প্রোটো অষ্ট্রোলয়েড, ভূমধ্য সাগরীয়, অ্যাল্পিলয়েড ও মঙ্গোলয়েড প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির এক মিশ্রদল এখানে বাস করত। কৃষিই তাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। এই দুই স্থানে চাষবাষের বহু যন্ত্রপাতি ,যব, গব, চানা, খেজুর, তরমুজ, তুলা ইত্যাদি নানা প্রকার শস্য ও ফলের বীজ পাওয়া গিয়েছে। ঐ সময়ে সেখানে যে গম ও বালির চাষ হত আজও পাঞ্জাবে সেই ধরণের শস্যের চাষ হয়ে থাকে। এ সময় এ প্রদেশে প্রচুর তুলার চাষ হত। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়াবাসীরা তুলাকে সিন্ধু এবং গ্রীকরা সিণ্ডণ বলত। উত্তর ভারতে বর্ত্তমানে যে প্রকার মোটা ও আঁশালো তুলার চাষ হয় মাহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় প্রাপ্ত তুলা সেই একই শ্রেণীর ছিল।

নব্যপ্রস্তর যুগ হতে আরম্ভ করে মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে আমরা জানতে পারি তখনকার ভারতীয়রা অনেক গাছপালা ও তা হতে উৎপন্ন জিনিষের সাথে পরিচিত ছিল। জমিতে উৎপন্ন শস্যাদি তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল। এইভাবে সভ্যতার অত্যাবশ্যক এক হিসাবেই ভারতে উদ্ভিদ বিস্তার আরম্ভ হয়।

তারপর আসে বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগে কৃষিবিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সময় ছুতার, রথকার প্রভৃতির মত কৃষক সম্প্রদায়ও গড়ে উঠে। বৈদিকযুগে কৃষিকার্য্যকে সর্ব্বপ্রধান



পেশারূপে গণ্য করা হত, জমি চাষের জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করা হত। ঋগবেদে তাহার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যথা

অর্ব্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥ ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৫৭ সুক্ত ৬ শ্লোক।

অথবা যেমন

শুনঃ নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভয়ন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্ ॥ ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৫৭ সুক্ত ৮ শ্লক।

জমিতে সার দিয়ে উর্ব্বরা শক্তি বাড়ানোর রীতিও সেই সময়ে প্রচলিত ছিল, অথর্ব্ব বেদে তার উল্লেখ আছে। যথা

সংজগ্মানা আবিভ্যুষীরস্মিন্ গোষ্ঠে করীষিণীঃ।
বিভ্রতীঃ সোম্যং মধ্বনসীবা উপেতচ ॥ অথর্ব্ববেদ ৩।১৪।৩
করীষিণীং ফলবতীং স্বধামিরং চ নো গৃহে।
ঔদুম্বরস্য তেজসা ধাতা পুষ্টিং দধাতু মে। অথর্ব্ববেদ ১৯।৩১।৩

ঋগবেদ, অথর্ব্ববেদ, রাজসেনীয় সংহিতা, তৈত্তিরিয় সংহিতা ইত্যাদি পাঠে জানা যায় বৈদিক যুগে যব, ধান, মাষ, তিল, মুগ, চানা, গোধুম, মসুর ইত্যাদি শস্যের চাষ হত, তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিভিন্ন শস্যের পরিপক্কতা ও কাটার সময়ও লেখা আছে। যথা

"যবং গ্রীষ্মায়ৌষধীর্বর্ষাভ্যো ব্রীহীঞ্ছরদে মাষতিলৌ হেমন্ত শিশিরাভ্যাং তেনেন্দ্রং প্রজাপতিরযাজয়ওতো বা ইন্দ্র।" তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭, ২, ১০, ২।

এই সকল বপন ও কাটার সময় নির্দ্দেশ হতে অনুমিত হয় যে সেই সময়ে শস্যাবর্ত্তন ( Rotation of crops ) প্রথা প্রচলিত ছিল, দুই তিন খণ্ড জমি নিয়ে শস্যাবর্ত্তন দেবার সময় একখণ্ডে ফসল লাগিয়ে অন্যখণ্ড পতিত রাখা হত, পরবর্তী যুগেও জমি পতিত রেখে শস্যাবর্ত্তনের নিয়ম সমর্থিত হয়েছে। যথা

তথা বর্ষেষু বর্ষেষু কর্ষণাৎ ভূগুণক্ষয়ঃ।
একস্যাং গুণহীনায়াং কৃষিমন্যত্র কারয়েৎ।
যুক্তি কল্পতরু-ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সম্পাদিত। ৬ পৃষ্ঠা।

বৈদিক যুগের পর আসে সংহিতা যুগ। সংহিতা যুগেই বোধহয় ভারতের কৃষি যন্ত্রাদির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সংহিতা যুগের যন্ত্রাদির ব্যবহার এখন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। এই যুগে পরাশর মুনি রচিত পরাশর সংগ্রহ বা কৃষি সংগ্রহ হতে আমরা অনেক বিষয় জানতে পারি। কৃষি পরাশরে কৃষিকার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব গোশালার নিয়ম, হালবাহী বলদের লক্ষণা লক্ষণ, হালচাষ, বীজ বপন, গোময় হতে সার প্রস্তুত প্রণালী, বপন, রোপন ইত্যাদি বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে এবং নানা বিষয়ে অনেক উপদেশও দেওয়া আছে, 'কৃষি পরাশর' প্রাচীন যুগের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আমাদের আহার্য্য সকল প্রকার শস্যই কৃষিকার্য্য হতে উৎপন্ন হয়। সেজন্য আমাদের জীবন-স্বরূপ কৃষিকে অবহেলা করা উচিত নয়। এই বিষয়ে কৃষি সংগ্রহে পরাশর মুনি বলেছেন

অন্নস্থ ধান্য সম্ভূতং ধান্য কৃষাবিনা নর।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারায়েৎ ॥
কৃষি ধর্ম্মা কৃষির্মেধা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদি দোষযুক্তেপি মুচ্যতে অতিথিপূজনাৎ ॥ কৃষি পরাশর

লাঙ্গল ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রের বর্ণনা কৃষি-পরাশরে বিশদভাবে লেখা আছে। ঈশ, যোয়াল-ইত্যাদি লাঙ্গলের উপাদানের বিবরণ, তাদের পরিমাপ ও প্রস্তুত প্রণালীও আমরা উক্ত গ্রন্থ হতে জানতে পারি, যথা

ঈশো যুগো হল স্থাণুর্নির্যোলস্তস্য পাশিকাঃ।
অড্ডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনী চ হলাষ্টকম্ ॥
পঞ্চহস্তো ভবেদীশঃ স্থাণুঃ পঞ্চবিতস্তিকঃ।
শার্দ্ধহস্তস্তু নির্যোলো যুগঃ কর্ণসমাপকঃ ॥
... ... ... ইত্যাদি কৃষিপরাশর

পরাশরের সময়ে যে সকল কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হত এখনো আমাদের দেশে তার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি।

গোময় সারের ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষি পরাশরে লেখা আছে—

মাঘে গোময়ং কূটস্থ সংপুজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সারং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈস্তোলেয় ততঃ ॥
রৌদ্রেঃ সংশোষ্য তৎ সর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডকরূপিনম্।
ফাল্গুনে প্রতি কেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নির্বাপয়েৎ ॥
ততো বপন কালেতু কুর্য্যাৎ সারবিমোচনম্।
বিনা সারেন যদ্ধানং বর্দ্ধতেন ফলত্যপি ॥ কৃষিপরাশর

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য জলের প্রয়োজন এ তথ্যও তাদের জানা ছিল। কৃষি পরাশরে বীজ বপন করার পূর্ব্ব রাত্রিতে হিমজলে ভিজিয়ে রাখার কথা লেখা আছে।

ধান রোপন ও বপন দুই প্রকার প্রক্রিয়াই সেই সময় প্রচলিত ছিল যথা—

বপনং রোপনঞ্চৈব বীজং স্যাদ্ দ্বয়াত্মকম্।
বপনং গদ নির্ম্মুক্তোং রোপনং সবাদং বিদুঃ ॥—কৃষিপরাশর

রোপন সম্বন্ধীয় নিয়মে শ্রাবন মাসে এক হাত, ভাদ্রে আধ হাত ও আশ্বিনে চার আঙুল অন্তর গাছ লাগানোর কথা লেখা আছে। যথা

হস্তান্তরং কর্কটে চ সিংহে চ হস্তার্দ্ধমেবচ।
রোপনং সর্ব্ব ধান্যানাং কন্যায়াং চতুরঙ্গুলম্ ॥—কৃষিপরাশর



ধানের রোগ বিষয়েও তখনকার লোকের জ্ঞান ছিল। নানা প্রকার কীট, পঙ্গপাল ইত্যাদি দ্বারা শস্যক্ষতির কথা কৃষিপরাশরে উল্লেখ আছে। তবে ঐ সকল রোগের প্রতিকারের জন্য তারা মন্ত্রতন্ত্রের উপরেই নির্ভর করত।

বিলফোর্ডের মতে খৃষ্ট পূর্ব ১৩৯১ সালে পরাশর মুনি বর্ত্তমান ছিলেন। বুকাননের মতে ঐ সময় খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৩০০ সাল। সে যাহাই হউক বর্ত্তমান সময় হতে প্রায় তিন হাজার বছর আগে পরাশর মুনি তার কৃষি-সংহিতা রচনা করেন। তার লেখা হতে আমরা জান্তে পারি তখনকার ভারতবর্ষের কৃষিবিজ্ঞান বীজ বপন, হাল চাষ, জল সেচন, বৃষ্টি তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বেশ উন্নত ছিল, আজকালও পঞ্জিকাতে জ্যোতিষশাস্ত্র মতে হালচাষ, বীজবপন ইত্যাদির জন্য শুভদিন ক্ষণ লেখা থাকে। এছাড়া আমাদের দেশের কৃষিবিষয়ক প্রবাদবচনগুলিও প্রাচীনকালের কৃষিবিষয়ে উন্নতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞানে বৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতামূলক বচনগুলি। যেমন বৃষ্টি লক্ষণ হতে শস্যের ফলন বিষয়ে খনার বচনে আছে—

কর্কট-ছরকট, সিংহ শুকা, কন্যা কানে কান
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথা রাখবি ধান।”

অথবা

ভাদ্রে রৌদ্র, আশ্বিনে বান
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

সংহিতা ও পৌরাণিক যুগের বহু মনীষী কৃষিবিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাহাদের রচনা যখন বিলুপ্ত প্রায়’ পরাশরকৃত কৃষি-সংগ্রহ ছাড়া বরাহমিহির কৃত বৃহৎ সংহিতাতেও কৃষিকর্ম্ম পর্যন্ত অনেক বিষয় জানা যায়।

বৃহৎ-সংহিতাতে লাঙ্গল প্রস্তুত প্রণালী, হাল যোজন, বীজবপন, কৃষির জন্য স্থান নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। তখন হাল যোজন ইত্যাদি কাজের পূর্ব্বে সীতার পুজা করা হত। বৃহৎ-সংহিতাতে সীতার পুজা মন্ত্রও লেখা আছে। যথা

সীতে সৌম্যে কুমারিত্বং দেবী দেবার্চ্চিতে প্রিয়ে।
সংস্কৃতাহি যথা সিদ্ধা তথা মে বরদা ভব ॥ বৃহৎ সংহিতা

আচার্য্য শার্ঙ্গধর প্রণীত “সুভাসিত শার্ঙ্গধর” গ্রন্থের ‘উপবন বিনোদ’ অধ্যায়ে, গাছরোপণ, মাটির প্রকার ভেদ, গাছের শ্রেণী বিভাগ, জলসেচন, পশু কীট ইত্যাদি হতে গাছ রক্ষার করার উপায়, গাছের নানা প্রকার রোগের প্রতিকার, তরল সার (কুপিজল) প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহার বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা ও উপদেশ দেওয়া আছে। বৃহৎ সংহিতা অগ্নিপুরাণ ইত্যাদিতে কুপি জল তৈরী করার ব্যবস্থা দেওয়া আছে, যেমন গোবর, ছাগলের মলমুত্র, গোমাংস, মাছ ধোয়ানো জল, দুধ, ঘি, খড়, বালি ইত্যাদি মিশিয়ে এবং পচিয়ে কুপি জল তৈরী করার কথা। এর ফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে

অনেনৈ চ তৈলেন শুষ্যমানা মহাদ্রুমাঃ।
সিক্তাং পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ ॥

ইহা ছাড়া অগ্নিপুরাণ গোরক্ষ সংহিতা, মহাভারত, মনু, স্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের কৃষি প্রণালীর ভূরি ভূরি প্রমান পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ যুগের ( খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬০০ শত বছর ) জাতক গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে জমিচাষ, জলসেচন প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উল্লেখ আছে !

প্রাচীন ভারত কৃষিকার্য্যে অত উন্নত ছিল কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্বেও হাজার হাজার বছর পরেও কেন আমাদের দেশে উন্নততর চাষবাসের প্রচলন হয়নি তা আশ্চর্য্যের বিষয় বোধহয় ভারতের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থাই এরজন্য দায়ী, সভ্যতা বিস্তারের পর হতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের জীবনরক্ষক কৃষকেরা 'চাষা' আখ্যা পেয়ে শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের কাছে অবনত হয়ে রয়েছে, শিক্ষা দীক্ষা হতে দূরে থাকায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করে তারা কৃষির উন্নতি করতে পারেনি।

# আবিষ্কার

## উৎপলা মুখোপাধ্যায়

নানান কাজের ভিড়ে দ্বন্দ্বময় সকালে সেদিন
দেখেছি পায়ের কাছে পিঁপড়ের ব্যস্ত চলাফেরা,
সূর্যের বিলাসী মন এপারে ওপারে উদাসীন,
দিগন্ত সমুদ্রনীল—পাহাড় বলয় দিয়ে ঘেরা
এঘরে ওঘরে গান, শিশুর হাসিতে নাচে দিন !

খেয়ালি পিঁপড়ে কি জানে এ পৃথিবী, কিংবা মায়াময়
আকাশ-প্রচ্ছদপট, পৃষ্ঠা যার কখনো খোলেনা ;
অথচ অস্থির মন-মানুষের অতৃপ্ত বিস্ময়
এ রহস্যে মাথা খোঁড়ে ; চিরব্যর্থ, তবুও ভোলেনা
এ ভাবেই দগ্ধ হতে, দুঃখ পেতে অনন্ত সময় ?

সুখী পিঁপড়ে, ছোট মন সার্থকতা পায় চিরকাল
এককণা শান্তি মেলে সে তার সমস্ত আয়োজনে,
অতৃপ্তির চরাচরে অজানার মগ্ন ইন্দ্রজাল
উদ্বিগ্ন করেনা তাকে, বিড়ম্বিত হয়না জীবনে ;
হয়তো তেমনই কেউ নিভৃতে সে-সুখেরই কাঙাল।

কার লীলায়িত মনে লীলাবতী এই ছোট মন
ব্যাপ্তি চায় বিস্ময়ের, রহস্যের জ্বালা চায় দূরে ?
একান্ত আশ্রয় নয়, শান্তি নয় পিঁপড়ের মতন,
দিগন্তের যন্ত্রণায় অব্যাহত বধির দুপুরে
প্রতীক্ষার পুণ্যতীর্থে চায় কি সে অকালবোধন ?

# অনেক দিনের শেষে

## শিবেন চট্টোপাধ্যায়

সেই ভালো—সরে যাও
হাজারো যোজন দূর দিনান্তের দেশে ;
যেখানে রোদের ডানা—মুছে দেয় অন্ধকার—কুয়াশার রঙ,
সবুজ মাঠের মন—দিগন্ত বাঁকোনো মেঘে নরম আবেশে
ডাগর দুচোখ তোলে ; বিমুগ্ধা নদী-নারী জলের ছায়ায়
ঘুম্‌ঘুম মাথা রেখে—স্বপ্নের রঙ মেখে—প্রহর কাটায়।

সেখানেই চলে যাও অনেক আরব সন্ধ্যা—বসন্তের গান
ফিরে যাক মাথা কুটে রুদ্ধদ্বার, ছোট জানলায়
হতাশ করুণ কান্না বুকে নিয়ে ; আবার আবার
অনেক দিনের শেষ—আলোক বর্ষপার
হেমন্ত সন্ধ্যায়,
ছল ছল ঢেউ তোলা অন্য এক নদীকূলে স্তব্ধ হতবাক
তোমাকেই খুঁজে পাবো, অন্ধকার ঝরে পড়া রাত মোহানায়
সামনে নদীর জল—যুগান্তের অন্ধকার—নক্ষত্র অবাক
অনন্ত রাতের স্বপ্ন—অকস্মাৎ মুখোমুখী—স্বর্ণালি আভায়।

# পরবাসী মন

## গোপাল ভৌমিক

যে রয়েছে বসে সাত সাগরের পারে
তারও কণ্ঠের আমেজ যে বারে বারে
ছুয়ে যায় আমাকেই
বুঝেছি সে কথা,
তাতে কোন ভুল নেই,
ঈথারে যা ভেসে ছিল এতকাল
তাকে আজ যন্ত্রেই
ধরতে তো পারি।
খুসি যদি হয় টেনে দেই দাড়ি
স্থান ও কালের বুকে ;
কান্নার মত গান হয় শুনি
টোকিও বা লণ্ডনে।
কিন্তু আমার সুখের এ তমসুকে
বাড়তি ঋণের প্রাবল্য দেখে হাসি ;
নতুনত্বের মোহ কেটে গেলে
দেখি আমি পরবাসী।

জানি আমি এই পৃথিবী আমার দাসী ;
যা কামনা করি নিত্য জোগায়
কিন্তু সর্বনাশী
পারে না মেটাতে এ মনের ক্ষুধা
যেহেতু সে যেলে পিছনে বসুধা
ধাওয়া করে দূর নক্ষত্রের পানে,
হাতে তার এই অমোঘ যন্ত্র
কিন্তু দুইটি কাণে

বাজে অদ্ভুত গান
বিজ্ঞানী যার পায় নিকো সন্ধান
সীমাহীন এই মহা ঈশ্বরের কোলে—
যুগযুগান্ত আলোড়ন শুধু তোলে।
যতই ভোলাই, এ মন কি তাতে ভোলে ?
প্রাণপণ করে ছন্দের ঝুমঝুমি
বাজালে কি হবে
শোনাতে কি তাকে পারি ?
যত খুসি আমি করি না সমন জারি
বিচিত্র তার গতি :
শত মাধুর্যমাখা এ আত্মরতি
নবজন্মের প্রতীক, সে নয় যতি।

---

গত সংখ্যার 'শকুন্তলা-কে' কবিতাটির লেখক-দেবপ্রসাদ ঘোষ।

# মুখোস

## প্রকাশ পাল

প্রতিদিন অফিস হইতে ফিরিবার পথে তাহার কাছে একবার দাঁড়াইয়া যাইতাম। বৃদ্ধা তাহার পসরা সাজাইয়া প্রতিদিন বৈকালে ওইখানে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার পণ্য দ্রব্যগুলির আকর্ষণে যে আমি তাহার কাছে যাইতাম তাহা নহে, বরং পণ্যের অপেক্ষা পণ্য-বিক্রয় কারিণীর প্রতিই আমার আকর্ষণ ছিল অধিক। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি তাহার বয়স। লোলচর্ম্ম, বলীরেখা অঙ্কিত মুখ, চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি, কম্পিত হস্তে পণ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদান এই সকলই আমাকে যেন তাহার কাছে প্রত্যহ থমকিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করিত। যখনই কাছে দাঁড়াইতাম তখনই সে একবার আমার দিকে চাহিত, তাহারপর দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিত, 'মুখোস নেবে বাবা ?' বুড়ি মুখোস বিক্রয় করিত।

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিতাম,—'না' একদিন বলিলাম, 'নাগো বুড়িমা, মুখোস নিয়ে আমি কি করব ?

বৃদ্ধা এবার একগাল হাসিয়া বলিল, 'কেন, ছেলেমেয়েকে দেবে।'

'হায়, হায় বুড়িমা, বিয়েই করিনি যে...'

'অমা, তাই নাকি, এখনো বিয়ে কর নি ?'

তারপর বোধ হয় একটু বিমর্ষ হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে ?'

এই 'তাহলে'র উত্তর দেওয়া সহজ নয়। বৃদ্ধা এমন পসরা লইয়া বসে যে আমার প্রয়োজনে তাহা লাগে না। অথচ তাহার উপর কেমন একটা সহানুভূতি গড়িয়া উঠিতেছিল যাহার ফলে তাহার নিকট সওদা করিতে না পারায় মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল।

প্রত্যহ দুই-চারিটা কথা বিনিময় করার ফলে বৃদ্ধা আমার সহিত অতি সহজ ব্যবহার করিতে সুরু করিল। আমি প্রায়ই দশ-পনেরো মিনিট ধরিয়া উহার সহিত আলাপ করি। কোন দিন জিজ্ঞাসা করি, 'বুড়িমা আজ কত বেচলে...?' বৃদ্ধা বলে, 'কত আর বাবা, পাঁচ গণ্ডা পয়সা' বলি, 'আর হবে আজ' ?

বৃদ্ধা হতাশভাবে বলে, 'উহু, আর হবার আশা নেই বাবা। তাছাড়া রাত হয়ে যাবে, যেতে হবে। বউটা আবার একলা আছে।' বউ অর্থে বৃদ্ধার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ।

একদিন বলিলাম,—'বুড়িমা, চারটে মুখোস দাও আমাকে—'

'অ-মা, তুমি আবার মুখোস কি করবে বাবা ? এই না বল্লে ছেলেপুলে নেই ?

হাসিয়া বলিলাম,—'বন্ধুদের ছেলেপুলে আছে তাদের জন্যে' বলা বাহুল্য সে আনন্দে অধীর হইয়া গেল, একসঙ্গে চারিটি মুখোসের খরিদ্দার বোধহয় জীবনে সে এই প্রথম দেখিল। কম্পিত হস্তে কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টি দিবে, কোন্ মুখোসটি ভাল হইবে তাহা বিচার করিতে করিতে করিতে বৃদ্ধা যেন বিব্রত হইয়া পড়িল।

একদিন ফিরিবার পথে দূর হইতে দেখিলাম তাহার উপর সরকারী বিক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। এক পাহারাওয়ালা বৃদ্ধাকে উঠিয়া যাইতে বলিতেছে, আর মুখোসের পসরাটি লইয়া টানা-হিঁচড়া করিতেছে। কাছে গেলাম। দেখিলাম সরকারী শান্তিরক্ষকের মেজাজটি পঞ্চমে অবস্থান করিতেছে। তাহার বক্তব্য বুড়ি অত্যন্ত বদ্‌মাইস্, সারা অপরাহ্নবেলা তাহাকে হয়রাণ করিয়াছে, যতবার তাহাকে তুলিয়া দিয়াছে ততবারই ফিরিয়া আসিয়া একই জায়গায় বসিয়াছে। আজ সে ছাড়িবে না, বৃদ্ধার মুখোসের পসরাটি সে থানায় লইয়া যাইবেই। বৃদ্ধা আকুল-স্বরে তাহার মার্জনা চাহিতেছে।

আমি যাওয়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল। আমায় দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া সে শুধু হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পাহারাওয়ালাটির কাছে গিয়া অনুরোধ করিলাম। কি জানি কেন তাহাতে ফল হইল। সে বলিল—'হাঁ ছোড়ে দিচ্ছি। লেকিন আজ ডি, সি সাব্ রোঁদে নিক্‌লাবে, আজ বোসা হবে নি—।'

বৃদ্ধাকে বলিলাম—'বুড়িমা, আজ বাড়ী যাও—'

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধার নয়নের জল আরও বেশি ঝরিতে লাগিল। কোনমতে বলিল, 'আজ এক পয়সাও বেচি নি বাবা—বেটি যে সারাদিন একাদশীর উপোস করেছে—কি দোব তাকে কিনে ?'

আমি আট আনা পয়সা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম—'এটা নিতেই হবে বুড়িমা—'

বৃদ্ধার অশ্রু আরও তীব্র হইল, শুধু বলিল, 'ভিক্ষে যে এখনো করি নি বাবা,···বেটি শুন্‌লে এ পয়সায় আনা কোনো জিনিষ দাঁতে কাটবে না।'

আমি বুঝিলাম তাহার আত্ম-সম্মানে আঘাত দিয়াছি। দরিদ্রের ঐটুকুই তো সম্বল। বলিলাম, 'বুড়িমা, আমি আটটি মুখোস কিন্‌লুম।'

বৃদ্ধা আটটি মুখোস আমার হাতে তুলিয়া দিল। তাহারপর একহাতে লাঠি অন্যহাতে কোমরে রাখা ঝুড়িটি ধরিয়া ন্যুব্জদেহে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া হাঁটিতে লাগিল। যাইবে সেই খালপারের বস্তিতে! এমন করিয়া এত আস্তে হাঁটিয়া পৌছিতে কতক্ষণ লাগিবে কে জানে।

বৃদ্ধার নিকট হইতে তাহার সংসারের ও জীবন-যাত্রার কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। সংগ্রহ করিয়াছিলাম বলিলে ভুল হইবে, সে কথায় কথায় স্ত্রী-সুলভ স্বভাব-বশত অনেক কথাই বলিয়াছিল।

থাকে খালপারের এক খোলার বস্তির একটা ঘরে। সে এবং তার বিধবা যুবতী পুত্রবধু। স্বামী মারা যাইবার পর বৃদ্ধার জ্যেষ্ঠ-পুত্র কোথায় যেন বৈরাগী হইয়া গিয়াছে। কেহ বলে হরিদ্বারে সন্ন্যাসী হইয়া আছে, কেহ বলে পাগল হইয়া রাঁচীতে আছে। বৃদ্ধার কনিষ্ঠ-পুত্রই ছিল বৃদ্ধার একমাত্র সম্বল। ছেলেটি ছিলও ভাল। বড় সাধ করিয়া সুন্দরী মেয়ের সহিত বৃদ্ধা কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু অভাগিনার অদৃষ্ট! এক বৎসর যাইতে না যাইতে যক্ষা হইয়া কনিষ্ঠপুত্র মারা গেল। পুত্রের চিকিৎসায় শেষ কপর্দ্দকটুকুও চলিয়া গেল। অবশেষে শাশুড়ী আর বধুতে মিলিয়া খালপারের বস্তিতে আসিয়া আশ্রয় লইল। চিরকাল ভদ্র পরিবারের বধু ও



মাতা তাহারা, কদর্য্যতম পরিবেশের মধ্যে দিনযাপন করিতেছে। বধুটি নাকি অত্যন্ত সুশীলা, কষ্টসহিষ্ণু। এত দুঃখ সহিয়াও শাশুড়ীকে যত্নে রাখিবার আকুল আগ্রহ তাহার। সেই সারা দিনরাত ধরিয়া এই মুখোসগুলি তৈয়ারী করে, রং করে, তারপর শাশুড়ীকে দেয় বিক্রয় করিতে। রোজই সে চায় শাশুড়ীর সঙ্গে আসিতে, কিন্তু পুত্রবধূ পথে দাঁড়াইয়া পণ্য বেচিবে এ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে বৃদ্ধা মৃত্যু কামনাই করে।

বাংলা দেশের অতি পরিচিত কাহিনীগুলিরই একটি কাহিনী। দুঃখ-বেদনা আর হতাশা নির্মমতার ছবি। তাই বৃদ্ধার প্রতি আমি কেমন যেন আসক্ত হইয়া পড়িতেছিলাম। ইহাদের কি কিছু সাহায্য করা যায় না ?

পুলিশী আক্রমণের পরদিন বৃদ্ধাকে সেই জায়গায় আর বসিতে দেখিলাম না। পর পর কয়েকদিন ধরিয়াই আর সে আসিল না। আশেপাশের ফিরিওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করিলাম কেহই বলিতে পারিল না। অবশেষে রবিবার বিকালে কি মনে করিয়া বৃদ্ধার সন্ধানে খালপারের বস্তির উদ্দেশ্যে চলিলাম।

নাকে রুমাল চাপিয়া ধরিয়া অনেক ময়লার স্তূপ ডিঙ্গাইয়া, অনেক কর্দ্দম কাপড়-চোপড়ে লিপ্ত করিয়া যখন বৃদ্ধার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

ডাকিলাম, 'বুড়ি-মা—' ভিতর হইতে এক নারী কণ্ঠের উত্তর হইল—'কাকে চাই—'

বলিলাম—'মুখোস বিক্রী করে যে বুড়িমা, সে কি এখানেই থাকে ?'

দরজা খুলিয়া গেল। সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকারে এক মহিলা ঘোমটা টানিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল। বলিল—'কি দরকার তাঁকে ?'

বলিলাম—'কেমন আছে সে, তাকে আর দেখতে পাইনা তাই খোঁজ নিতে এসেছি—'

এমন সময় ভিতর হইতে বৃদ্ধার গলার আওয়াজ আসিল 'কে রে বউ ? কার সঙ্গে কথা কইছিস ?'

আমি গলা উঁচু করিয়া বলিলাম—'আমি বুড়িমা'

মহিলা এবার মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'আসুন ভিতরে—উনি অসুস্থ।—'

খোলার বাড়ীর একেবারে অন্ধকারতম কোণের একটি ঘরে উহারা বাস করে। একটা পচা গন্ধে বাড়ীটাই কেমন দুর্গন্ধময়। ঘরে গিয়া প্রথম ঠাহর করিতে পারিলাম না ঘরে কেহ আছে কিনা। বধুটি একটি কেরোসিনের টেমি লইয়া আসিল। সেই ধূম-নির্গত শিখার আলোকে দেখিলাম বৃদ্ধা শুইয়া আছে;—কয়দিনেই তাহাকে অনেক খারাপ দেখাইতেছে। ডাকিলাম,— 'কেমন আছো বুড়িমা—'

বৃদ্ধা প্রায় পুলকে নাচিয়া উঠিল। বোধ হয় ইহা তাহার কল্পনার অতীত। এই নিঃস্ব পরিবারের বিপদে যে কেহ দেখা দিয়াও সান্ত্বনা দিতে আসিবে—একথা তাহারা হয়তো ভুলিয়া গিয়াছে। আবেগে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

'বাবা, তুমি'—হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল সে। কান্না থামিলে বৃদ্ধা আমায় আপ্যায়ন

করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দুর্বল কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব উঁচুতে তুলিয়া পুত্রবধূকে নানা হুকুম করিতে লাগিল।

যুবতী মহিলাটি মাথায় ঘোমটা টানিয়া নীরবে শাশুড়ীর আদেশ পালন করিতেছে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে না।

বৃদ্ধা তারপর সাংসারিক কথাবার্তা কহিতে লাগিল। আমি শ্রোতা, ধৈর্য্য সহকারে সব কথা শুনিয়া যাই। বৃদ্ধা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এক সময় বলি—'বুড়িমা, এত ভয় কিসের ?'—অবশ্য ইহা নিছক সান্ত্বনাই।

বৃদ্ধা বলিল, 'আমার জন্যে নয় বাবা, ওই ওটার জন্যে। সোমত্ত বউ—একরাশ রূপ। কোথায় থাক্‌বে আমি গেলে ?'—বলিয়া পুত্রবধূর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। আমি সেদিকে চাহিলাম।—

এতক্ষণ তাহাকে দেখি নাই। দেখিবার কৌতূহলও জাগে নাই। কিন্তু এই বস্তির ঘরে এই কদর্য্যতম পরিবেশে কেরোসিনের টেমির স্বল্প আলোকে বিষাদময়ী যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা কোনদিনই আশা করি নাই। একটা শতছিন্ন মাদুরের উপর বসিয়া সে একরাশ সুপারী কাটিতেছিল। ঘোমটা একটু সরিয়া গিয়াছে। মুখের একপাশে আলোর আভা পড়িয়াছে। রুক্ষ চুল গালের, কপালের উপর ছড়ানো। চোখের ভাব বুঝিলাম না, কারণ ও একমনে সুপারী কুটিতেছে। দৃষ্টি নীচের দিকে নিবদ্ধ।

কতক্ষণ এইভাবে চাহিয়াছিলাম বলিতে পারি না। এক সময় বধূটি আমার দিকে চাহিল। আমি যে তাহারই দিকে চাহিয়া আছি বুঝিতে পারে নাই, আমার চোখে চোখ পড়িতেই চকিতে ঘোমটা টানিয়া মুখ নামাইয়া লইল। আমারও ইহাতে স্বম্বিৎ ফিরিল। বৃদ্ধা বলিতেছে,—'কি করি বল্‌তে পারো ? আমায় যে ছোঁড়ারা এমন করে নাগপাশে বেঁধে রাখবে, তা কি জান্‌তুম্ ?'—আবার কান্না।

এতক্ষণে অন্ধকার চোখে সহিয়া গিয়াছিল। অনাড়ম্বর আসবাবহীন কাঁচাঘরের চারিদিকে চাহিয়া] দেখিতেছিলাম। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিতে দু'টি অসহায় বঙ্গললনার যে আকুল প্রচেষ্টা তাহারই চিহ্ন সর্বত্র। একরাশ সুপারী কাটা, কোণে জমা করা কাগজের তৈয়ারী ঠোঙ্গা, দেওয়ালের গায়ে সারি সারি সাজানো বিচিত্র রকমের মুখোস।—

বুঝিলাম ওই শান্ত সংযত মূর্ত্তিটির হস্তের স্পর্শই সারা গৃহে। এত পরিশ্রম, অথচ অঙ্গে তাহার শতছিন্ন ধূলি-মলিন শাড়ী। বিধবা হইলেও এই কাঁচা বয়সে সাদা থান পরিয়া চোখের সম্মুখে সে ঘুরিবে—এ দৃশ্য শাশুড়ী সহ্য করিতে পারে না বোধ হয়।

একসময় বলিলাম—'উঠি বুড়িমা, আবার দেখে যাবো একদিন।' বৃদ্ধা একগাদা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। পুত্রবধূ নীরবে আমার সাম্‌নে চলিল আমাকে আলো দেখাইয়া। সদর দরজার কাছে আসিয়া বলিলাম, 'মাঝে মাঝে দেখতে এলে আপত্তি আছে আপনার ?

যুবতী উত্তর দিল না, শুধু মাথা হেলাইয়া জানাইল তাহার কোন আপত্তি নাই।

ইহার পর হইতে বেশ উপরি উপরি কয়দিন গিয়াছি বৃদ্ধাকে দেখিতে। এত ঘন ঘন যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ত ছিল না, তবু যাইতাম। মনের সহজাত প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিতাম, আহা,



উহারা এত দরিদ্র, অসহায়; বৃদ্ধা আমাকে দেখিলে নিজের হারানো পুত্রসন্তানদের মত মনে করিয়া হয়ত কত সান্ত্বনাই না পায়, মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে সেই সান্ত্বনাটুকু হইতে বঞ্চিত করা আমার পক্ষে উচিত হইবে কি ? আমার এই ঘন ঘন যাওয়াতে অন্যায় বা অশোভন কিছুই নাই।

সন্ধ্যার সময় অফিস ফেরৎ যাইতাম। জানিতাম অর্থ সাহায্য উহারা লইবে না, তাই ফলমূল সঙ্গে লইয়া যাইতাম। ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে বৃদ্ধার পুত্রবধূরও আর তত লজ্জা ছিল না ঘোমটা টানিয়া দেয়না। কথাবার্ত্তাও কহে, তবে তেম্‌নি শান্ত সংযত-ভাবেই। লজ্জার বাহুল্য নাই, অসঙ্কোচ প্রকাশটাও মাত্রাতিরিক্ত নয়। বেশ লাগে। বৃদ্ধার সঙ্গে দুই একটি কথা বলি প্রয়োজন মত, কিন্তু কোন্ সময় শাশুড়ী আমাদের কথাবার্ত্তার মাঝখান হইতে বাদ পড়িয়া যায় তাহা খেয়াল থাকে না। অবশেষে একসময় বধূটিই বলে,—'শাশুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছেন, রাতও প্রায় নটা বাজলো বোধহয়—'

আমি লজ্জিত হইয়া উঠিয়া পড়ি; বধূটি আলো দেখায়, সদর দরজার নিকটে আসিয়া আমি বলি—'আচ্ছা—

এর দিনকয়েক পরে বৃদ্ধার অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। বৃদ্ধার পুত্রবধূর বারণ সত্ত্বেও আমি ভালো ডাক্তার ডাকাইয়া দেখাইলাম। ডাক্তার আমায় একান্তে ডাকিয়া বলিল, 'আশা নাই।'

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া ঘরে ফিরিলাম। শাশুড়ীর বিছানার কাছে বধূ বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। মাথায় তাহার ঘোমটা ছিল না আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিল—'কি হবে ?'

বলিলাম, 'কি হবে ? শাশুড়ী কি চিরকাল বেঁচে থাকবে বলে আশা করেছিলেন ?'

'কিন্তু শাশুড়ী গেলে আমার কি হবে ?'

কথাটার মধ্যে কি ছিল বলিতে পারি না। আমার মনে হইল পৃথিবীর সমস্ত অসহায়তা যেন ওই কথা কয়টির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমার সমস্ত বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠিল,—হঠাৎ তাহার খুব কাছে বসিয়া তাহার একটি হাত ধরিয়া বলিলাম,—

'শাশুড়ী গেলেও আমরা তো আছি—আমি তো আছি……'

আমার এই আচরণে ও যেন হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রথমটা যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর সম্বিৎ পাইয়া ধীরে ধীরে আমার হাতের ভিতর হইতে নিজের হাতটি ছাড়াইয়া লইল। বেশবাস সংযত করিয়া মাথায় ঘোমটাটি টানিয়া দিল। তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া অদ্ভুত একটি হাসি মুখে ফুটাইয়া বলিল,—'এতদিন জানতাম আমি অসহায়। কিন্তু দেখলাম তা নয়; আপনারা আছেন সবাই, আপনি তো আছেনই……' মনে হইল দেওয়ালের মুখোসগুলি এই কথার সঙ্গে সঙ্গে হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

রাত্রির অন্ধকারে দুহাতে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপায়ে ঘরে ফিরিতেছি। আমার মুখোসটি বৃদ্ধার পুত্রবধূ আমার মুখ হইতে টানিয়া খুলিয়া লইয়াছে।

# হ্যারল্ড লাস্কির রাষ্ট্রদর্শন

জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত

রাষ্ট্রচিন্তায় হ্যারল্ড লাস্কি বহুবল্লভ। তাঁর আদর্শবিচারে ভ্রান্তিযোগ এড়ানো কঠিন। কারণ যুগভেদে এত বিভিন্ন আদর্শের প্রতি তিনি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ঢেলে দিয়েছেন যে লাস্কির সত্যিকারের প্রিয়তম আদর্শ কোনটি তার ঠিকানা পাওয়া রীতিমত কষ্টকর। সময়ের স্রোতে এক একটি আদর্শ ভেসে এসেছে সামনে, আর লাস্কি তাকে টেনে নিয়েছেন একান্ত আপন করে। খেয়াল রাখতে সময় পাননি যে কি বিষময় পরিণতি হ'ল এতে পুর্বপ্রণয়ের। অথচ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারেননি আগের নিজের হাতে গড়া প্রতিমাকে। এইভাবে অশান্ত শিল্পীর মত এক এক প্রতিমা গড়ে তুলেছেন আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, আবার কিছুদিন পরেই ব্রতী হয়েছেন নতুন রূপকল্পের নেশায়। ফলে জীবনের শেষবেলায় বড় করুণ মনে হয়েছিল লাস্কিকে—অতৃপ্তি আর অপূর্ণতার দাহনে দগ্ধ এই দার্শনিক সেদিন শুধু সহানুভূতির ফুলেই বিদায় সম্বর্দ্ধনা পেলেন; শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিকের আকাঙ্ক্ষিত আসনটি পেলেন না।

তবে অনস্বীকার্য্য তার দান। বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ লাস্কির রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে সত্যিই নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। ফরাসী দার্শনিক রুশোর মত তাঁর স্থান। যুক্তির মাপকাঠিতে না টিকলেও রাষ্ট্রচিন্তায় শুধুমাত্র বিষয়-সমারোহ ও চিন্তার স্বকীয় প্রকাশ-ক্ষমতায় এই দুই দার্শনিকের স্থান অনেক যুক্তিস্বচ্ছ দার্শনিকের চেয়ে উপরে। কারণ এখানে স্থানের বিচার যুক্তিগ্রাহ্যতায় নির্ণীত হয়না; সমকালীন চিন্তাজগতে এবং ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাই এখানে মূল দিশারী। তাই আজও রুশোর মত খামখেয়ালী ভাববিলাসীর রাষ্ট্রদর্শনে এত সমাদর, অথচ একই মঞ্চে ডেভিড হিউমের মত সত্যিকারের যুক্তিবাদী, বিদগ্ধ এবং ক্ষমতাবান দার্শনিকের এত অনাদর।

হ্যারল্ড লাস্কির সমকালীন ব্রিটেনে তাঁর প্রভাবের প্রসার আজও অনির্ণীত। অবশ্য এ প্রভাবের সুদূর-প্রসার সর্বমনে স্বীকৃত। বিশ্ববিখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তার পীঠস্থান এবং সমাজবাদীর চিন্তা-প্রসারে অগ্রগণ্য লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌স এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স আজও লাস্কির সম্মানে গর্বিত। শিক্ষক হিসাবে লাস্কির আসন অতুলনীয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে, প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে নিজের বন্ধুর মত একাত্ম হতে লাস্কির ক্লান্তি আসেনি কখনও। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় উচ্চপদে সমাসীন বহু ব্যক্তিই লাস্কির প্রাক্তন ছাত্র। ব্রিটেনের শ্রমিক মহলে অনেক নেতাই লাস্কির সাহায্য নিয়েছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্তে। এ ছাড়া সরাসরি শ্রমিক মহলের বহু আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। অধ্যাপনার সম্মানিত আসন সাধারণ মানুষের সমাজবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পথে বাধাপ্রস্তরের কাজ করতে পারেনি কোনও সময়েই। এইজন্যই লাস্কির মূল্যায়নে "মানুষ লাস্কির" স্থান সর্বাগ্রে। লাস্কির রাজনৈতিক আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বিস্মিত হতে হয় গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যে। সারাজীবনে এত লিখেছেন যে



আশ্চর্য হতে হয় লেখকের পাণ্ডিত্যে এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে। তবুও সব ছাপিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের আলোচনা লাস্কির রাষ্ট্রদর্শনে প্রধান। প্রথম জীবনে স্বাধীনতাই ছিল তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য। স্বাধীনতার জয়গানে সে যুগে লাস্কি মুখর। রাষ্ট্র এই সময়ে তাঁর কলমে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। রাষ্ট্র-সন্দেহবাদ ( State Scepticism ) ইংরেজের মজ্জায়। জন লক থেকে এ সন্দেহের সূত্রপাত—হার্বার্ট স্পেনসারে এই সন্দেহ প্রায় প্রলাপে পরিণত হয়েছে। মধ্যিখানে জন ষ্টুয়ার্ট মিল। ইনি রাষ্ট্রসন্দেহকে আভিজাত্য প্রীতির সঙ্গে মিলিয়ে সময়ের তালে পা ফেলে চলতে চেয়েছিলেন। বিংশশতাব্দীতে লাস্কির লেখায় পুনর্জাগরিত হ'ল রাষ্ট্রসন্দেহ। এখন এ সন্দেহ বিদ্বেষের পর্য্যায়ে নেমে এল। লাস্কির লিপিচাতুর্য্যে মানুষের অমূল্য ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল। সামাজিক নাটকে ভিলেনের রূপসজ্জায় সজ্জিত হ'ল রাষ্ট্র। সগর্বে ঘোষিত হ'ল সার্বভৌমিকতার অবসান এবং "contingent anarchy"এর জয়গান।

মনে হ'ল এক আকস্মিক ঝড়ে অষ্টিন ও অন্যান্য আইনজীবিদের এত সাধের জ্বালানো আলো যেন নিভে এল। বলা হ'ল—সমাজের মানুষই একমাত্র সত্য। তার বিকাশই রাজনীতির প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। মানবমন বিচিত্র চিন্তার বহুমুখী আধার। একই সঙ্গে একই ব্যক্তি শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মসন্ধানী, অর্থ-সন্ধানী, জ্ঞান-সঞ্চয়ী এবং সংস্কৃতিকামী। এ ছাড়াও তার মনে আরও অনেক প্রতিযোগী চিন্তার ঘনবসতি। তার চাওয়া অফুরন্ত। প্রতিটি চাওয়াকে সফল করতে গেলে, পাওয়ার প্রচেষ্টার প্রভেদ ঘটবেই। এর থেকেই অনুভূত হয় বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রচেষ্টার প্রয়াস। ব্যক্তি নিজে একলা ক্ষমতাহীন। অথচ সমষ্টিগতভাবে সংহত শক্তির মাধ্যমে তার শক্তি অনস্বীকার্য্য। এই নিরন্তর সংহতির প্রয়াসে জন্ম নেয় বিভিন্ন সমিতি। এক একটি সমিতির মাধ্যমে এক একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করে। তাই সমাজ বহুধাবিভক্ত—অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধর্ম্মকেন্দ্রিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমিতিগুলি সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এর মধ্যে রাষ্ট্র মাত্র একটি সমিতি। অতএব কি প্রয়োজন তাকে সর্বপ্রসারী ক্ষমতাদানের? চাই ক্ষমতার সমবণ্টন বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যে। বিভিন্ন সমিতির উদ্দেশ্যগত মূল্যায়ন যখন সমপ্রসারী, উদ্দেশ্যের সিদ্ধিপথের অন্যতম অস্ত্র জনতারও চাই সমপ্রসার, সমবণ্টন। অসমবণ্টিত ক্ষমতার বীজ বিপজ্জনক—কারণ এই বীজ ধীরে ধীরে বিভিন্ন নেতৃত্বপ্রয়াসীর ছল ও কৌশলের আলো হাওয়ায় পরিণত হয় সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের বিষবৃক্ষ।

গণতন্ত্রের স্বপক্ষে, স্বাধীনতার সমর্থনে চিন্তমুক্তির প্রসারকল্পে লাস্কির এই বহুত্ববাদী ( pluralist ) রাষ্ট্রদর্শন অত্যন্ত মূল্যবান। সামাজিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এই নীতির অন্যতম শুভফল হতে বাধ্য। কিন্তু লাস্কির প্রেম ক্ষণস্থায়ী। বিংশশতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে পরিবেশিত[1] এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ঘুণ ধরল তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে—তাঁর সর্বখ্যাত গ্রন্থেও[2]। এখানে রাষ্ট্রের হাতে সামাজিক সংহতিবিধানের ক্ষমতা প্রদত্ত। অন্য সমিতির তুলনায় রাষ্ট্র এখনও

[1] Cf. (a) Studies in the Problem of sovereignty (1917).
(b) Authority in the Modern State (1918).

[2] A Grammar of Politics (1925).

ভ্রাতৃস্থানীয়—কিন্তু নিঃসন্দেহে অগ্রজ। অথচ শৃঙ্খলাসাধনের একক দায়িত্ব রাষ্ট্রযন্ত্রে অর্পণের অর্থই হ'ল শক্তির অসমবণ্টন। অতিরিক্ত শক্তি প্রদানের আরেকটি অর্থ অতিরিক্ত মর্যাদা আরোপ। অথচ এই পর্য্যায়ে লাস্কি এ মর্য্যাদানে অসমর্থ।

বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকে বহুত্ববাদের অনেক সাধের সাজানো বাগান শুকোতে সুরু করল। এবার নাটকের নায়িকা কার্ল মার্কস। নব-অভিসারের প্রাথমিক পর্য্যায়ে লাস্কির পদক্ষেপ সন্ত্রস্ত, সংযত। ইংরেজ সমাজ তখন বিরাট এক পরিবর্ত্তনের মুখে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বৃদ্ধা প্রাক্তন নায়িকার মত পর্দার অন্তরালে পালিয়ে যাবার আয়োজন করছে। সমাজবাদের যৌবন-দীপ্ত নবনায়িকা যুগের আসন দখল করতে এগিয়ে আসছে। রুশদেশে বিপ্লবের সাফল্য এবং প্রথম মহাযুদ্ধের হতাশা, দুয়ে মিলে আগামী বৃহত্তর সমাজবিপ্লবের পটভূমি রচনায় ব্যস্ত। লাস্কি এবার থেকে সমাজবাদী। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদ তার কাম্য। রাশিয়ার বিপ্লবের হাতছানি তাঁর চোখের সামনে মায়া জাল বিস্তার করেছে কিন্তু মার্কসবাদের লেনিনবাদী ব্যাখ্যায় অগণতান্ত্রিক তত্ত্বে তাঁর আস্থা নেই। সিডনী ও বিয়েত্রিস ওয়েবের রাষ্ট্রবাদী সমাজবাদেও তাঁর অনাস্থা। কারণ সমাজবাদের এ দুটি ধারাই আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মিত্র এবং তৎকারণেই ব্যক্তিসত্তা-বিকাশের দুরূহ প্রতিবন্ধক। অতএব এখন তাঁর সমাজবাদ জনবাদী ও গণতন্ত্রপন্থী সমাজবাদে আস্থাশীল। এই ধারা ক্রথেঁা, ব্রে ও টমসনের লেখায় সোচ্চার। এদের মতপ্রসঙ্গে লাস্কির স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য—"The most fruitful hypothesis of modern politics"*। ব্যক্তিবাদে প্রণয়ক্লান্ত রাষ্ট্রচিন্তাবিদের আদর্শ নতুন জীবনের অমৃতধারা লাভ করল জনকেন্দ্রিক সমাজবাদের সোণার কাঠির অব্যর্থ পরশে। নববিবাহের চিত্তচাঞ্চল্যে ঘোষণা করলেন রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের ব্যর্থতা, যেহেতু এই রক্ত বিপ্লবের ধারা সহনশীলতা ও মানবতাবোধের শত্রু এবং হিংসা ও ঘৃণার মিত্র। এই প্রসঙ্গে লেনিনকে মুসোলিনির সমপর্য্যায়ে ফেলবার লোভটিও ত্যাগ করতে পারেননি—"save in intensity, he (Laski) finds no difference in their methods, and he believes that Fascism's ultimate spirit is in no way dissimilar from that of Soviet Communism."** উদ্ধৃতিটি লাস্কির রাষ্ট্রচিন্তাপ্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ গবেষণা পুস্তক থেকে সংযোজিত। এর সমর্থন তাঁর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ছড়ানো।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের এ আস্থা যদি মূলতঃ অপরিবর্তীত থাকত তাহলে পরবর্তী যুগের চিন্তাজগতে লাস্কির দান শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হ'ত। কারণ গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজবাদের কোনও চিরোবিরোধ অনুপস্থিত। বরং আজকের স্বাধীনতা সামাজিক মানুষের স্বাধীনতা এবং সমাজের কর্তৃত্বে অর্থনীতির মূল কার্য্যাবলী পরিচালিত হলে তাকে অভিনন্দিত না করার কারণ অত্যন্ত অল্প। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা বিধান রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়—অন্যতম মিত্র। এই দুটি নদীর মিলিত মোহানায় মানুষের সত্যিকারের মুক্তি।

* Cf. Political Thought in England : From Locke to Bentham : Pp. 315.
** The Political Ideas of Harold Laski.—Herbert Deane (1955).



কিন্তু বহুবল্লভের প্রেম পদ্মপত্রে জল। তাই চিত্তমুক্তির মহিমায় সমুজ্জ্বল জনবাদী সমাজ-বাদের হিমছায়া পরিত্যাগ করে হিংসাত্মক সমাজবাদের উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন করতে ব্রতী হলেন লাস্কি। ইতিহাসের তরী ইতিমধ্যে "মহাশিল্প পতনের ( Great Depression ) আঘাতে বিধ্বস্ত। ইংরেজ সমাজের ভিত নড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক নেতৃত্বের টনক নড়েছে। ওদিকে লেবার পার্টির নেতৃত্বের দোষে শ্রমিক সংস্থা মন্ত্রীত্বের গদী হারিয়েছে। চারদিকে কেমন যেন এক ভাঙ্গা গড়ার মরসুম সুরু হয়েছে।

লাস্কি এই ঘটনাধারায় অস্থির হয়ে বিরাট এক ভুল করলেন। তাঁর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ পরিবর্ত্তনের পথ সম্বন্ধে সব আশা হতাশার দিগন্তে মিলিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাকে তিনি পুঁজীবাদের ষড়যন্ত্র বলে ঘোষণা করলেন। বললেন—মার্কসই ধ্রুবতারা, গণতন্ত্রের পথে সংগ্রাম সফল হতে পারেনা। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধমান শিল্পপতিশ্রেণী আজ তাদের সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়ে উপস্থিত। এবার তাদের অত্যাচার-মহল থেকে গণতন্ত্রের পর্দা সরে গেছে। দেশে দেশে সুরু হয়েছে এবং সত্বর ছড়িয়ে পড়বে রক্তকামী পুঁজীবাদের মরণ-সংগ্রামের অগ্নিশিখা। মার্কসের বই থেকে ধার করে জোর করে বললেন এটা ইতিহাসের অমোঘ গতিপথ—এ সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

রাষ্ট্রদর্শনে লাস্কির শ্রেষ্ঠ দান "বহুত্ববাদ" এখন থেকে পরিত্যক্ত হ'ল। "গ্রামারে"র চতুর্থ সংস্করণে নতুন ভূমিকায় বলা হ'ল "It (Pluralism) did not sufficiently realise the nature of the state as an expression of class relations." রাষ্ট্র প্রসঙ্গে শ্রেণীব্যখ্যা পরিপূর্ণ সমর্থন করলেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর যুক্তির সীমারেখা অতিক্রম করে অতিরিক্ত জোর দিতে সুরু করলেন। এবং এই মতবাদের নেশায় বলতে লাগলেন যে রাশিয়ায় স্বাধীনতার প্রাণকেন্দ্র। সেখানে মানুষের মুক্তির আস্বান সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়—"In the since the October Revolution, more men and women have had more opportunity of self- flfilment than anywhere else in the world."*

এই উক্তিমালা মানবিক মুক্তিবোধের উপর ভিত্তি করা রাষ্ট্রদর্শনের কবর রচনার পথ প্রশস্ত করে। অথচ মানুষ লাস্কির প্রাণের অন্তঃস্থল তখনও সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রের শেষ রেশটুকুকে নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে দিতে চায়না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনের শেষদিনও পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত।

অনুসন্ধানের আলোতে লাস্কির সারাজীবনের ফসল পরীক্ষা করে, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়ে পড়ে, যে তাঁর প্রচেষ্টা সমস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর শ্রদ্ধার বস্তু। এ কথা সত্যি যে কার্ল ম্যানহাইমের মত সমকালীন পৃথিবীর অন্যতম সমাজসমস্যা স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন তিনি ঘটাতে পারেননি ; কাল পপারের মত সমগ্র ইতিহাসের তথ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে মানবমুক্তির অন্যতম শত্রুদের মুখোস খুলে ধরতে পারেননি ; ম্যাকস্ ওয়েবারের মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামাজিক বিশ্লেষণের পথ খুলে দিতে পারেননি ; এমনকি হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের মত সংখ্যাতাত্ত্বিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রচেষ্টার যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারেননি। হয়ত এর জন্য দায়ী তাঁর চিন্তা ও লিপি-ক্ষিপ্রতা। কিন্তু অবশেষে একথা মানতেই হবে যে এযুগের রাষ্ট্রচিন্তা তা সত্বেও লাস্কিকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায়না। লাস্কির প্রতি ইতিহাসের এ বিচার অমূল্য অর্ঘ্যসম।

মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে লাস্কি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সময়ে অক্সফোর্ডের একজন অধ্যাপক বলেছিলেন—"এ যুগ লাস্কির"*। অন্ততঃ এ ভাষণের অংশসত্য অনস্বীকার্য্য।

* Faith, Reason and Civilisation. Pp. 57.
* Harold Laski, a Biographical Memoir—by Kingsley Martin.

# এক ছিল কন্যা

( পূর্বানুবৃত্তি )

## স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

### পাঁচ

আগাগোড়া এক দুঃস্বপ্নের মত কেটে যাচ্ছে মৃগনয়নীর দুটো দিন। তরঙ্গিণী আর পুঁটি আজ যাবে না। মৃগনয়নীর মামা শ্বশুর আজ এসেছিলেন বরকর্তা হয়ে। তিনি জানালেন,—বনবিহারী আজই যাবে। মৃগনয়নীকে আজই যেতে হবে শ্বশুর বাড়ী।

শ্বশুরবাড়ী ভাবতেই মৃগনয়নীর মনে প্রথমে একটা আতংক এলো। তার এক ভাসুর। এক দেওর। আরও কানে এলো সধবা একটি ননদ আছে সংসারে। বিধবা শাশুড়ী আছেন। মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী শ্বশুর বাড়ীর চেহারাটা। সবাই যদি এর মতো রূঢ় হয়? সবাই যদি তার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। অনেক জোড়া ক্রুদ্ধ বিরূপ চোখ ওর মনের ওপর ভেসে ওঠে। ও যেন দেখতে পায় এক ঘৃণা অবহেলায় মেশানো কতকগুলো দৃষ্টি।

আতংকে ঘেমে উঠল মৃগনয়নী।

বাড়ীটা কেমন কে জানে? হয়তো খুব ছোট। বড়ও হতে পারে। এত মানুষ যে সংসারে, সেখানে ছোট বাড়ী কেমন করে হবে?

দরিদ্রের ঘর। আগাগোড়া শুনে এসেছে ও। দরিদ্র মানে কেমন ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারে না। আশৈশব স্বাচ্ছন্দে থেকে ওর ধারণাটা এর চেয়ে অনেক নীচে নামতে পারে না। দরিদ্র মানে অনেক বাড়তি টাকা নেই। অনেক সজ্জা অলংকার নেই। তা না থাক। মৃগনয়নী অলংকার চায় না। অতিরিক্ত সজ্জায় রুচি নেই ওর। একজনও কি বন্ধু পাওয়া যাবে না সেখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ননদটি তো ভাল হতে পারে। হতে পারে দেওরটি ভাল। কোন প্রতিবেশিনীর বন্ধুত্ব পাবার সুযোগও থাকতে পারে।

ধীরে ধীরে মন ওর শক্ত হয়ে আসে। যেখানে যেতেই হবে সেখানে যাবার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত করে নেয় নিজেকে।

দুপুরের খাওয়া মিটে যায়। দুপুর গড়িয়ে গেছে।

সবাই এখন মৃগনয়নীর যাত্রার জন্যে ব্যস্ত। মেয়েরা তোরঙ্গ গোছাতে লেগেছে। মৃগনয়নীকে সাজাতে বসেছে কয়েকটি মেয়ে। কয়েকটি যোয়ান ছেলে বিছানা বাঁধছে।

মুখরা প্রতিবেশী মেয়েরা মুখে পান ফেলে ওর শ্বশুর বাড়ীর আলোচনায় মেতে আছে। ওর মাকে বলছে একজন,—আজই না গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হোত!

মা বলে ওর মামা শ্বশুর বললেন;

—বললেই হোল! কর্তাবাবু তো বলতে পারতেন।

—কর্তার কথাও শোনেননি।



—সে কি গো!—নাকে হাত দেন—কি গোঁয়ার রে বাবা! এমন গোঁয়ার গুষ্টির হাতে পড়ে মেয়ে তোমার বাঁচলে হয়!

—সবই বরাত মা!

—এবার ঘুরে এলে আর ছেড়ো না। জোর করে মেয়ে রেখে দেবে।

মা হেসে পানের পিক ফেলে বলে—তা কি হয়, মেয়েকে যে পর করে দিইচি, তারা বাঁচালে বাঁচবে। তারা মারলে মরবে।

মৃগনয়নীর কানে সব কটি কথা এসে পৌছায়। একটি মেয়ে চুল বাঁধছিল ওর।

মৃগনয়নী মনে মনে শক্ত হয়ে উঠেছে। একটু বাঁকা হাসি দেখা যায় ওর ঠোঁটে তাঁরা বাঁচালে বাঁচবে তাঁরা মারলে মরবে।

মায়ের শেষের কথা কটি যতখানি নিষ্ঠুর, ততখানি সত্য। কিন্তু এই দুটি পথ ছাড়া আর কি কোন পথ নেই? নিশ্চয়ই আছে! মৃগনয়নী তার সন্ধান জানে না। তার মা মাসীরাও জানে না। এক অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া। চিরদিন ধরেই নাকি চলে আসছে। যা চিরকাল চলছে, মৃগনয়নীর পক্ষে তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

তবু ভয় পাবে না ও। তার ভাগ্য খারাপ তাই ভয় পাওয়া তার চলবে না। ভয় মানে মৃত্যু।—বাবার কাছে শুনেছে মৃগনয়নী।

ছোটবেলা থেকে ভীতু ছিল ও। একবার গাব্ গাছের নীচে মাথা কাটা একটি দেহ দেখেছিল মৃগনয়নী। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। মৃগনয়নী ফিরছিল অন্য তরফ থেকে বেড়িয়ে। গাবগাছের নীচে বহুকাল থেকেই একটি পুরোনো ইঁদারা মজে বুঁজে গেছে। একা একা আসতে ওর কেমন একটু ভয় ভয় করছিল। ও পরিষ্কার দেখেছিল ওই পুরানো ইঁদারা থেকে উঠলো একটি দেহ তার মাথা নেই। ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ও একছুটে বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকে বাবার কোলের ওপর পড়ল।

রামতারণ জপ করছিলেন।—কি হোল মা?

—কন্দ কাটা ধরতে আসছে।

—কোথায়?

—ওই গাবগাছ তলায়।

—তা এলেই বা!—হেসে বলছিলেন রামতারণ।

বাবার পূর্ণ নির্ভয় স্বরে ভয় ওর কোথায় উড়ে গেল।

রামতারণ বললেন—চলো তো তাঁকে দেখে আসি।

—ওরে বাবা! পেছোয় মৃগনয়নী।

—আমার হাত ধরে এসো। রামতারণ ওর হাত ধরে সেই ইঁদারার কাছে যায়।

—ওই ত। চেঁচিয়ে ওঠে মৃগনয়নী।

সত্যিই একটি মস্তকহীন মূর্তি দেখা যায়।

রামতারণ বলেন, চেঁচিও না। ভয় পেও না। দাঁড়াও এখানে।

তারপর নিজে সেই মূর্তিটির হাত ধরে মৃগনয়নীকে ডাকেন—দেখবে এসো।

মৃগনয়নী ধীর পায়ে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় বিরাট লক্ষ্মীপ্রতিমার খড় বাঁধা মূর্তি। মাথার দিকে খড় নেই।

—একে দেখে তুমি ভয় পেয়েছিলে। হাসতে হাসতে রামতারণ ওকে নিয়ে আসেন ভেতর বাড়ীর দিকে। আসতে আসতে বলেন—ভয় পেয়ো না। ভয় পাওয়া মানে মরা ওর চেয়ে পাপ আর নেই।

বাবার সে কথা আজও ভোলেনি মৃগনয়নী। ভয় পাওয়া মানে মরা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেখেছে মৃগনয়নী সংসারে খড় বাঁধা মূর্তি দেখে অকারণে ভয় পাওয়াই মানুষের স্বভাব। ভয়ের জন্ম ভেতরে। ভয় না থাকলে, বাইরের কিছুই মানুষকে ভয় দেখাতে পারে না।

শ্বশুর বাড়ীর চিন্তার যে ভয় সেটাও হয়তো খড়বাঁধা প্রতিমাকে ভূত কল্পনা করে অহেতুক ভয়। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী। যা হবার, তাকে আটকাবার যখন উপায় নেই। তখন ভয় পেয়ে মিছে পাপের বোঝা ও বাড়াবে না।

যাবার সময় হয়ে এলো। উৎসবের শেষে যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সমস্ত বাড়ীখানা! এবার আর একবার সবাই সজাগ হয়ে উঠলো। বরযাত্রীরা রওনা হয়ে গেছে সঙ্গে গেছে বরকন্দাজ। পাল্কী এসেছে। মালপত্র সব চলে গেছে। মৃগনয়নীর কাছে এসেছে পুঁটি। পুঁটির সিঁথির সিঁদুরটা জলজ্বল করছে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে মুখে হাসি নেই। বললে মৃগনয়নীকে—ভয় করছে না।

মৃগনয়নী একটু হাসবার চেষ্টা করে কিন্তু চোখদুটো জলে ভরে ওঠে ধরা গলায় বলবার চেষ্টা করে—না।

পুঁটি ওর হাতখানা ধরে, আমার ভাই ভয় করছে। ভয় পাওয়া মানে মৃত্যু।—বলতে ইচ্ছে হয় মৃগনয়নীর। কিন্তু কথা বলতে পারে না। বলতে ইচ্ছে হয় না।

তরঙ্গিনীও এসেছে। সিঁথির সিঁদুরের চেয়ে উজ্জ্বল ওর মুখের হাসি। মৃগনয়নীর চোখে জল দেখে ওর মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়। ঘরের বাতাস কেমন কান্নাভরা মনে হয়। মৃগনয়নী কর্তামাকে প্রণাম করে। কর্তামা চোখ মোছেন আঁচলে। মাকেও প্রণাম করে। মা ওকে জড়িয়ে ধরে।

এ এক দুঃসহ বিচ্ছেদ, তবু অন্তরের আনন্দের আশীর্বাদের স্রোত বয়ে যায় সকলেরই মনে। ও সুখী হোক। আহা ওর কপাল ভাল নয়। ভেতরের প্রণাম চুকিয়ে বাইরে আসে। কর্তাবাবুকে প্রণাম করতে হয়। কর্তাবাবু তাকাল। রামের এই শ্যামলা মেয়েটা। চলে যাবে আজ।

কর্তাবাবু শুধু বলেন,—অসুবিধে কিছু হলে হৃদয়কে দিয়ে জানাস্।

ঝি যাচ্ছে। হৃদয়ও যাচ্ছে মৃগনয়নীর সঙ্গে। ওকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। ওর



শ্বশুর বাড়ী দুদিন থাকতেও পারে। ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে হৃদয়। দেখে আসবে ওর শ্বশুরবাড়ীর হালচাল। এসে সংবাদ দেবে। একজনকে দেখা যাচ্ছে না এই কান্নার অভিসারে। সে রামতারণ। মৃগনয়নী বাবার ঘরের দিকে এগোয়। রামতারণ জপ করছিলেন বসে বসে ওকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু হাসলেন। অতি প্রশান্ত হাসি। প্রসন্নতায় ভরা। বাবার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে মৃগনয়নী আর সামলাতে পারলো না নিজেকে। কেঁদে ভেঙে পড়ল।

—ওঠো। ওঠো। কেঁদো না।—রামতারণ ওকে তুলে ধরলো নিরুদ্বেগ আদরে। মৃগনয়নীর গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। এইবার আর একবার তার বড্ড ভয় করছে এক অজানা সংসারে প্রবেশ করতে। তার যে বরাত খারাপ সবাই বলে। রামতারণ ওর দিকে আবার একটু হাসলো, বললো একটা কথা মনে রাখতে পারবে? শান্তি যদি চাও মা, নিজের দোষ দেখো। অন্যকারো দোষ দেখো না।

মৃগনয়নী যেন মন্ত্র পেলো। দীক্ষা মন্ত্র। নোতুন সংসারে যাবার আগে দীক্ষা হোল তার। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল মৃগনয়নী।

বনবিহারীও এসেছে। প্রণাম করল রামতারণকে। রোগা ফরসা ছেলেটি। পিঠে হাত বুলিয়ে রামতারণ চুপ করে রইল। জপে বসল আবার। ওরা এসে পাল্কীতে উঠল। পাল্কীর দরজা আধখানা ভেজিয়ে দেওয়া হোল।

সবাই দাঁড়িয়েছে বাইরে। পুঁটি তরঙ্গিনী। মা, মাসী জেঠি সবাই। পাল্কী এগিয়ে যাচ্ছে। এক উচ্ছ্বসিত কান্নার শব্দে সবাই তাকিয়ে দেখল, তরঙ্গিনী কাঁদছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। আশ্চর্য।

## ছয়

বরযাত্রীরা আগেই খবর দিয়েছে বরকনে আসছে পেছনের গোরুর গাড়ীতে। মৃগনয়নী যখন গোরুর গাড়ী থেকে নামল, দেখল বউবরণের জন্য দাঁড়িয়ে আছে অনেক অবগুণ্ঠনবতী, অনেক বৃদ্ধা, আরও অনেক মানুষ, জমিদার বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করে এসেছে বনবিহারী। যেন মেয়ে দেখবার কৌতূহল সবায়ের। মৃগনয়নীকে হাত ধরে নামাল গাড়ী থেকে একটি বউ। বউটির দিকে ভাল করে তাকাল ও। ভাসা ভাসা দুটি চোখ, রঙটা কুষ কালো। মুখভরা হাসি। বললে,—এসো ভাই। বড় মধুর লাগলো আহ্বানটি। এই মৃগনয়নীর মেজজা'—সরলা।

নামল মৃগনয়নী ধীর পায়ে। বরণডালা নিয়ে এলো সধবার দল। ঘরে তুললে ওদের।

ফরসা রোগা এক বিধবা এলেন কাছে। সেই কালো বউটি বললে,—মা। প্রণাম করো।

এই শাশুড়ী। মৃগনয়নী ভাল করে তাকাল। আশীর্বাদ ভরা চোখ দুটো নিয়ে বললেন মা:—আহা বড় ভাল বউ হয়েছে। দেখেই বুঝতে পারছি। প্রণাম করল মৃগনয়নী।

—এই ঠাকুরঝি।—বললে আবার মেজ জা। তাকাল মৃগনয়নী।

মুখখানা অস্বাভাবিক লম্বা, তার ভেতর চোখদুটো বড় বড়—যেন জলছে। বেঁকে পড়ছে। মৃগনয়নীর চোখে সে চোখ যেন ছুঁচ বেঁধালো। চোখ নামাল মৃগনয়নী।

—দেখি বাছা ভাল করে আর একবার তাকাও তো? বলে উঠল মহিলাটি। বেশ শুনিয়ে শুনিয়েই বললে তারপর,—চোখটা যেন একটু ট্যারা-পানা মনে হোলো। কই গো বউ তাকাও না? কানদুটো লাল হয়ে উঠল মৃগনয়নীর। বেশ বড় বড় চোখ করে তাকাল!

—ও বাবাঃ। এ যে গিলতে আসছে! কি চাউনী রে বাবা! বলি ন'দাদা কি বাঘিনী ধরে আনলে না কি গো!

খাশুড়ী বলে উঠলেন,—আঃ! তুই এখান থেকে যা দিকি সুন্দরী।

ঠাকুরঝির নাম সুন্দরী। বড়ই নামানসই নাম। এত রাগেও হাসি পেল মৃগনয়নীর। পরে শুনেছিল ওর নাম শুধু সুন্দরী না—প্রমদাসুন্দরী।

'মেজজা' সরলা কানের কাছে মুখটা এনে বললে,—একে সামলে নিও ভাই। নইলে মুস্কিল হবে। তাকাল মৃগনয়নী। হাসিভরা মুখখানি সরলার। রাগটা পড়ে গেল মৃগনয়নীর। মুখ নীচু করলে।

প্রমদাসুন্দরী চলে গেছে। মায়ের কথায় নয়। সবাইকে নোতুন বউয়ের চোখের খবরটা জানাতে। নোতুন বউয়ের প্রশংসা নিন্দে যা হবার গ্রামে দুচার দিনেই সেটা রটে যায়। রটনার মূলে কেউ কেউ থাকে; কিন্তু শুধু রটনায় সবাই সন্তুষ্ট হয় না। দলে দলে আসে রটনার সত্যকে যাচাই করে নিতে।

বেলা অনেকটা বেড়ে গেছে। এ বেলা পড়শিনীদের আসা আর সম্ভব নয়। বিকেলে সব আসবে। প্রমদাসুন্দরীর কথাগুলোও যাচাই হবে।

কিছুক্ষণের মত ছুটি। সরলা ওকে নিয়ে এল তার নিজের ঘরে। তোরঙ্গ খুলে শাড়ী বার করলো। নারকেল তেলের পাত্র এনে মৃগনয়নীর চুল খুলে নিজেই ওর চুলে তেল মাখাতে লাগল।

—আহা গো, চাঁদিটা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। এত বেলা হোল। হবে না?

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—চলো ভাই ঘাটে চলো। চান করে কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হও।

ঘাটে চললো মৃগনয়নী ওর সঙ্গে।

বাড়ীটা একবার দেখে নিল এতক্ষণে। তিনখানা টিনের ঘর। একটা মাঝারি উঠোন। একখানি রান্নাঘর—টিনের চালা এক কোণে।

—এও তো ছিল না। মামাশ্বশুর দিয়েছেন। এরা তো সব মামার বাড়ী মানুষ। ছোট বেলায় শ্বশুরঠাকুর মারা গেছেন। শাশুড়ী চার ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী রইলেন। বাপের বাড়ীতে কত অত্যোচার সয়ে ছেলে কটিকে বড় করলেন। তারা আর এক সঙ্গে থাকতে চাইলে না। তাই মামাশ্বশুর এই বাড়ীখানা করে দিলে আর কি জমি লিখে দিলে শাশুড়ীর নামে। এতে কোন মতে চলে। সরলা বলছিল মৃগনয়নীকে ঘাটে যেতে যেতে। ঘাটে গিয়েও



—তার ওপর ননদ রয়েছে সংসারে। আট সতীনের ঘরে বিয়ে দিলে কুলীনের মেয়েকে। নন্দাই বিয়ে করে চলে গেল—মাঝে কুল রক্ষে করে গেল। আর এলো না। তাইতো এখানে রয়েছে ও আমাদের জালাতে। তা আর কোথায় যাবে বলো ভাই। তবে মাঝে মাঝে এত বাড়াবাড়ী করে। পরশু তো আমায় গালে এমন দুটো আঙুলে ঠোনা মারলে ভাই। দেখ গালটা দেখো।

চমকে উঠলো মৃগনয়নী। মারলে! তাকেও মারবে নাকি?

—বড় ভাসুর তো বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ী ঘরজামাই হয়ে আছেন রাজার হালে।

—তাই নাকি? এতক্ষণে একটা কথা বলতে পেরেছে মৃগনয়নী।

—হ্যাঁ গো! সে এ বিয়েতেও আসেনি। শ্বশুরবাড়ী থেকে ছাড়ে না। শুনি নাকি জোতদার শ্বশুর। মেলা টাকা। মেজ ভাই, ন'ভাই, আর ছোট। দেওরটির কি রাগ! দুদিন দেখলে টের পাবে!

—খুব রাগী বুঝি? মনে মনে আতংকিতা হলেও মুখে একটু হাসে মৃগনয়নী।

—ভীষণ। স্নান সারা হয়ে এলো ওদের।

সরলা বলে,—দুদিনেই সব দেখতে পাবে। চলো ভাই কথায় কথায় অনেক বেলা হোল। ওরা ঘাট থেকে বাড়ীর পথ ধরে।

প্রমদাসুন্দরী এতক্ষণে পাড়া টহল দিয়ে ফিরছেন কিনা কে জানে। ঘাটে দেরী হোল আবার খেঁকিয়ে না উঠে। সরলার অমন হাসি হাসি মুখখানিও একটু শুকিয়ে যায় যেন। লক্ষ্য করে মৃগনয়নী। কিছু বলে না।

ওরা সটান সরলার ঘরে চলে আসে। ঘরে বসে চুল আঁচড়ে, সিঁদুর পরে, শাড়ী পালটে আসতে আসতে বেলা বেড়ে যায় অনেক। মাথার ওপর চন্‌চনে রোদ্দুর। মৃগনয়নীকে নিজের ঘরে বসিয়ে সরলা রান্নাঘরের দিকে এগোয়। এসে দেখে প্রমদাসুন্দরী মাছের ঝাল চাপাচ্ছে। রাঁধছে আজ পাশের বাড়ীর মঙ্গলার মা। এ বাড়ী ও বাড়ী রাঁধুনীর কাজ করেই বেড়ায় সে।

—আর দুটো মাছ দাও ঠাকুরঝিকে।—সরলা বলে মঙ্গলার মাকে।

—প্রমদাসুন্দরী একটু খুসী হয়, মুখে বলে,—থাক্, আর লাগবে না। নুনে ঝালে একেবারে আচারের মত লাগছে। খাসা রেঁধেছে। যাই বলো মেজ বৌ। তোমাদের মাছের ঝাল মনে হয় যেন ফ্যান দিয়ে রেঁধেছ, এত পান্‌সে হয়! যা বলব মুখের ওপর।

ও কথার জবাব না দিয়ে সরলা বলে,—দাও আর দুটো মাছ।

মঙ্গলার মা আর দুটো মাছ চাখ্‌তে দেয় প্রমদাকে। প্রমদা খুব খুসী।

সরলা এই ফাঁকে বলে,—ঠাকুরঝি নোতুন বৌকে একটু জল খেতে দোব। সন্দেশের হাঁড়িটা কোথায়?

—হাঁড়ির খবরে তোমার কি দরকার। একি নবাবের সংসারে এয়েচে যে জল খাবার খাবে? দাদারা খেতে আসবে এখুনি। একবারে ভাত খেয়ে নেবে।

মুখখানি ম্লান করে চলে যায় সরলা শাশুড়ীর ঘরে। শাশুড়ী বসে মালা ফেরাচ্ছিলেন।

—কি বৌমা ?

সরলা বলে নোতুন বৌয়ের জলখাবারের কথা।

শাশুড়ী মালা রেখে ওঠেন—ঠিক বলেছো মা। বড়ঘরের মেয়ে, এত বেলা অব্দি না খেয়ে থাকা অভ্যেস নেই। আমি সন্দেশ দিচ্ছি দুটো।

প্রমদার বিছানা আর চৌকী এই ঘরেই। তার বিছানার পিছন থেকে হাড়ি বার করে সন্দেশ বার করে দেন শাশুড়ী। সরলা সন্দেশ দুটি হাতে নিয়ে ছুটে ওর নিজের ঘরে চলে আসে।

এসে মৃগনয়নীর মুখে একটা সন্দেশ গুঁজে দেয়।—খাও, খেয়ে নাও দিকি। জল দিচ্ছি। সরলার হাসিভরা মুখখানির দিকে আবার তাকায় মৃগনয়নী ভয় তাহলে ওর নেই। যা জানবার মেজ জায়ের কাছ থেকেই জেনে নেবে। সব বিপদের একমাত্র ভরসা।

তিনভাই বাড়ী ফিরেছে। গোলমালে বুঝতে পারে সরলা।

—এতক্ষণে বাবুরা এলেন !

বাইরে থেকে চীৎকার শোনা যায়,—অ বৌঠান ! বৌঠান কোথায় ?

সরলা মৃগনয়নীর সামনে এক গেলাস জল রেখে বলে,—ওই ঠাকুরপো ডাকছে। বৌভাতের বাজার নিয়ে এলো। তুমি বোস আমি আসছি।

বেরিয়ে যায় সরলা। মৃগনয়নী একা একা বসে থাকে।

সংসারটি মন্দ লাগে না ওর। দরিদ্র ছোট গৃহস্থ পরিবার। মেজ জার কোন সন্তান নেই। কথাটা না বললেও দেখে বুঝতে পারে ও। এখানেই কি সারা জীবন কাটাতে হবে ? এই তিনখানি টিনের ঘর, এই ছোট একটু উঠোনে ? ভাবতে কেমন হাঁপ লাগে ওর। যে সংসারে মানুষ হয়েছে ও, তার বিশালতার কাছে এ সংসারের ক্ষুদ্রতা ওর অনুভূতিকে কুঁকড়ে দিতে চায়। কে জানে পুঁটিদির শ্বশুরবাড়ী কেমন হোল। দিদি কেমন ঘরে গিয়ে পড়ল। পুঁটিদির কথা ভেবে মনটা ওর বেদনায় টন্‌টন্ করে। বড় ভীতু মানুষ পুঁটিদি। বড় তরাসে। ভাল করে কারো সঙ্গে দুটো কথা বলবার দরকার হলে আগে দু গেলাস জল খেয়ে নেয়। নোতুন সংসারে গিয়ে ও কি মানিয়ে নিতে পারবে ? দিদি পারবে। তরঙ্গিণীর সাহস আছে। সুন্দরী মুখরা তরঙ্গিণী পরকে আপন করে নিতে জানে। ওর জন্যে ভাবনা নেই।

গলা খাকারির শব্দে চমকে ওঠে মৃগনয়নী।

বনবিহারী।

ফরসা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে রৌদ্রের তাপে। পিঙ্গল চোখ দুটিতে ভাবলেশহীন একটু হাসি। —এখানে বসে কেন। মার কাছে যাও না ?

এই প্রথম সম্ভাষণ। স্বামী সম্ভাষণ। মৃগনয়নীর মাথার ঘোমটা টেনে দেয়। বনবিহারী কি ভেবে একবার ঘরে ঢোকে।

মৃগনয়নী লজ্জায় চোখ নামায়। ছি, ছি, কেউ যদি এসে পড়ে। কি ভাববে। বুকটার ভেতর শব্দ হয়, দ্রুত নিশ্বাস পড়ে।



বনবিহারী আবার কি ভেবে ঘরের বাইরে যায়। চলে যায় সেখান থেকে।

বাঁচল মৃগনয়নী। যদি কাছে আসত ? হাতটা চেপে ধরত ? নয়ত কাছে এসে বসে পড়ত। কি আরও কিছু কথা বলত। ব্যঙ্গে কথা—অথচ মিষ্টি কথায় ? তবে কি ভাল লাগত ওর ? ভাল লাগত খুব। এক কাল্পনিক আনন্দে তন্ময় হয় ও। ওর জীবনে এই প্রথম পুরুষ কল্পনা। এর আগে কল্পনাতেও কোন পুরুষের কাছাকাছি ও যেতে চায় নি। ওর মনেই হয়নি এ সব কথা। তরঙ্গিণীকে দেখেছে পুলকিত হতে। ও নিজে পুঁটিদির সঙ্গে এ সব মধুর স্বপ্ন থেকে তফাতে থেকেছে। তাই এ অনুভূতি ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

বনবিহারী তার জীবনের একমাত্র পুরুষ। এই ভাবনা আজ এই মুহূর্তের আগে পর্যন্তও তাকে বিভ্রান্ত করেনি।

মৃগনয়নী চোখদুটি নামিয়েই বসে থাকে। কেমন এক মিষ্টি আবেশের ভেতর ডুবে গেছে ওর মন। কতক্ষণ এ ভাবে কেটেছে ওর খেয়াল ছিল না। সরলা ঘরে ঢুকতে ও চমকে তাকায়।

—চলো ভাই খাবে চলো। তোমার বরটি ভাই একবারে ভোলানাথ।

মৃগনয়নী চোখে কৌতুক নিয়ে তাকায়।

—বরাবরই ভীষণ সরল আর রাগী। ওকে ঠিকমত চালিয়ে নিও ভাই। ও মায়ের কাছে গিয়ে কি বললে জান ? বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ে সরলা।—তোমার ভাসুর বসে ঠাকুর পো বসে। ও গিয়ে হঠাৎ বলে,—কই এখনও আসেনি ? আমরা তো চমকে তাকাই। কে আবার আসবে। তা আবার বলে, ওই যে তোমার বৌকে বলে এলুম এখানে আসতে। শুনে আমি লজ্জায় হাসি চাপতে গিয়ে মুখে আচল গুজি। তোমার ভাসুর মুচকী হাসতে লাগল। মা বললে, যা হতভাগা, তোকে কে বলতে বলেচে। বৌ ঘরে না তুলতেই হুকুম হচ্ছে, বেরো। বেচারী ধমক খেয়ে হকচকিয়ে চলে গেল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে আমার।

মৃগনয়নী লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। ছি, ছি, কি লজ্জা ! কি করে সবাইকে মুখ দেখাবে ও। এমন মুখ আল্‌গা স্বামী নিয়ে ও কি করবে—সত্যি তোমায় এসে কি বললে ভাই ? বলতে বলতে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে সরলা।

মৃগনয়নী মুখ লাল করে বসে থাকে।

—বললে বুঝি, মার কাছে যাও ?—আবার সরলার হাসি।

মৃগনয়নীরও হাসি পায় এবার। ঠোঁটে হাসি চেপে বসে থাকে। কথা বলে না।

—এসো। খাবে এসো। বিকেলে আবার মাসীপিসীর দল আসবেন।

মৃগনয়নী ওঠে। সরলা ওর হাত ধরে নিয়ে চলে রান্নাঘরের দিকে। চোখে পড়ল হৃদয়দা বসে আছে বাইরের দাওয়ায়। হৃদয়দাকে দেখে ওর মনটা খুশী হয়ে ওঠে আরও। খুশী মনে খাবার ঘরে যায়।

( ক্রমশঃ )

# আদিম মানুষ ও শিল্পকর্ম

## নিখিল বিশ্বাস

সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল খৃঃ পূঃ তিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এই সময়ের বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস আমরা বহু নিদর্শনের মধ্যে দেখতে পাই। মানুষ হঠাৎ নিশ্চয়ই এই শিল্প প্রয়াসের যুগে আসে নি। ঠিক এই স্তরে আসবার আগে তাকে আরও অনেকগুলো যুগ পার হয়ে আসতে হয়েছে। সেই পার হয়ে আসা যুগগুলোর মধ্যেই আদিম প্রত্নমানব আপন অনুভূতির স্বাক্ষর অন্ধকার গুহার মধ্যে লুকিয়ে এঁকে রেখেছে। যেখান থেকে মানুষ স্তরে স্তরে নিজের অমার্জিত ভাব ও ভাষাকে মার্জিত ও সুসংবদ্ধ করে তুলেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, ভারতবর্ষেও প্রত্ন গুহাশিল্পের নিদর্শন আমরা পেয়েছি। সমগ্র গুহাচিত্রশিল্পের মধ্যে অনুভূতি ও বস্তু-সাদৃশ্যের দিকটাই আগে চোখে পড়ে, যে কারণে মনে হয় যে আদিমকালে মানুষ, সে যে জায়গারই মানুষ হোক না কেন, একটা প্রধান অনুভূতির কথা সাজিয়ে রেখেছে রং আর রেখায়। আধুনিক যুগে বসে এই অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করলে সত্যই একটা বিস্ময় জাগে। এই গুহাচিত্রের কথা বিশ্লেষণ করবার আগে আদিম মানুষের একটা ধারাবাহিক বংশ-পুঞ্জ আলোচনা করলে আমাদের অনেক সাহায্য করবে। আদিম মানুষের ধারাবাহিক বংশ পুঞ্জ :—

(ক) প্র-প্রত্নমানব (Eolithic) প্রথম প্রস্তর যুগের আভাষ খৃঃ পূঃ ১,০০০,০০০—৫০০,০০০

॥

(খ) প্রত্ন-মানব (Paleolithic) পুরাতন প্রস্তর যুগ খৃঃ পূঃ ৫০০,০০০—২০,০০০

তৃতীয় উষ্ণ হিমানী প্রবাহকালের পর

(১) চিলীয় মানব ( Chellean man )

(২) পিল্টডাউন ও হেডেলবার্গীয় মানব (Piltdown and Heidelbeng)

চতুর্থ হিমানী প্রবাহের পর

(৩) মাউসট্রেনিয় মানব ( Mousterian ) ও নিনানডারথিয়াল মানব ( Neandertal )

(৪) আরুগ্‌নেসীয় মানব ( Aurignacian ) অথবা আরুগনেসীয়কাল সেই সময়কালীন ক্রোম্যাগনন্ মানব ( Cro-magron )

(৫) সলুট্রেনীয় মানব ( Solu trean )

(৬) ম্যাগডেলীয়নীয় মানব ( Magdalenian )

॥

(গ) নব্য ও প্রত্ন-যুগের মধ্যকালীন অবস্থা ( Mesolithic period )
খৃঃ পূঃ ২০,০০০—১২,০০০

॥



(ঘ) নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic and chaleolithic ) Period
খৃঃ পূঃ ১২,০০০—৩,০০০

॥

(ঙ) তাম্রযুগ ( Bronze age ) খৃঃ পূঃ-৩০০০-১০০০

॥

(চ) লৌহ যুগ ( Iron age ) খৃঃ পূঃ ১০০০—খৃঃ পর যুগ

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে আদিম মানুষের গুহাশিল্প প্রধানতঃ প্রত্নযুগীয় ( Paleolithic )। কারণ এই প্রত্নমানবীয় যুগে মানুষের মধ্যে ধর্মের অনুভূতি বা অলৌকিক ঈশ্বরানুভূতি কোন মতেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। এর বিশেষ কারণ হিসাবে বলা যায় যে নব্যপ্রস্তরযুগের animism বা দ্বৈতজগত সম্পর্কে অনুভূতির জ্ঞান, যাতে করে জ্যামিতিক কিংবা অলংকরন শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল, সম্পূর্ণভাবে প্রত্নযুগে এটা অজ্ঞাত ছিল। এইজন্য এই প্রত্নযুগীয় শিল্প সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিধর্মী বা naturalism এর আওতায় পড়ে।

আরুগ্‌নেসীয়কালে শেষ চতুর্থবার হিমানীপ্রবাহ ইউরোপে প্রবাহিত হয় ( সময়কাল খৃঃ পূঃ ২০,০০০ বছর আগে ) যার ফলে নিনানডারথিয়াল মানুষের আয়ুকাল শেষ হয় এবং মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রো-ম্যাগননীয় মানুষ ডানিয়ুবনদীর ধারে য়োরোপের বসতিস্থাপন-সম্ভাব্য জায়গায় ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্রো-ম্যাগনন জাতীয় মানুষ তার পূর্বকালীন পিল্টডাউন, হেডেলবার্গীয়, মাউসট্রেনিয় মানুষ অপেক্ষা অনেকবেশী বুদ্ধিশালী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সৌষ্ঠব সম্পন্ন ছিল। প্রকৃতভাবে বলা যায় যে প্রত্ন-মানবীয়যুগে এই ক্রো-ম্যাগনন জাতীয় মানুষ আদিম গুহাচিত্রে একটা অনন্যসাধারণতার ছাপ নিয়ে আসে। এরা মৃত মানুষদের সমাধি দিত আর সমাধিকালে মৃতের খুলিতে নানা রং দিয়ে একে দিত। একটু মার্জিত শিল্পবোধ সম্ভবতঃ এই ক্রো-ম্যাগনন জাতীয় মানুষ থেকেই আসে। প্রাচীন প্রত্ন-গুহাশিল্পে পাথর খোদাই মূর্তি সমাবেশের গোড়ারদিকটা এই ক্রো-ম্যাগনন মানুষই আমদানী করে। ঠিক প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর যুগের মধ্যকালীন কালের পূর্ববর্তী ম্যাগডেলীয়নীয় মানুষ একটু বর্ণনামূলক ছবির প্রস্তাবনা আনে। আরও একটু উন্নত শিল্পবোধ বিশেষ করে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই সময়েই আসে। এই প্রসঙ্গে Ray mond S. Stites তাঁর 'The Arts and Man' বইয়ে বলেছেন, "...in addition to the rhythmical pattern exemplifiedin the Font de Gaume reindeer, the narrative pictures make itsappearance."

আরুগনেসীয় কালের হিমানীপ্রবাহের ফলে এই ক্রো-ম্যাগনন মানুষের বিভিন্নস্থানে অবস্থিতি একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার। কারণ পরবর্তীকালের বিরাট সভ্যতার কেন্দ্রহিসাবে যে সমস্ত জায়গা ইতিহাসে স্থান নিয়েছে, সেগুলো পূর্বে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের বাসস্থান ছিল। ভারতবর্ষেও কি এই ক্রো-ম্যাগনন মানুষ তার পূর্ববর্তী চিলীয় মানুষের স্থান নিয়েছিল। ভারতবর্ষেও প্র-প্রত্নযুগ, প্রত্নযুগের কাল ছিল। প্রত্ন-মানবযুগীয় চিলীয় মানুষের অস্তিত্ব আমরা

পেয়েছি। কিন্তু প্রস্তযুগের পর নব্যপ্রস্তরযুগীয় কোন নিদর্শন সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রগুলো থেকে পাওয়া যায় নি। যদিও নব্যপ্রস্তরযুগীয় নিদর্শন দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গিয়েছে তাতে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা পূর্ববর্তীদের সরিয়ে দিয়ে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল। আর সিন্ধুসভ্যতার পূর্ববর্তী ক্রো-ম্যাগনন জাতীয় মানুষ, কিংবা ম্যাগডেলীয়নীয় মানুষ কি এই গুহাচিত্রে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তবে একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে ক্রো-ম্যাগননীয় মানুষের কালে পাথর খোদাইএর কাজের সমতুল্য কাজ আমরা ভারতবর্ষে পেয়েছি এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন কিংবা দৃষ্টিকোণের বিভিন্নদিকগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রস্থ-যুগীয় গুহাশিল্প পৃথিবীর অন্যান্য ক্রোম্যাগননীয় গুহাশিল্প এবং ম্যাগডেলীয়নীয় গুহাশিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেছে। তাতে করে এটা বলা যায় যে ভারতবর্ষের আদিম গুহাশিল্প ক্রো-ম্যাগননীয়, কিংবা ম্যাগডেলীয়নীয় কালের। প্রকৃতির অদ্ভুদ তাপমাত্রার জন্যে মাউসট্রেনিয় মানুষের কোন গুহাচিত্র ভারতবর্ষে থাকা সম্ভব নয় এবং ভারতবর্ষের এই প্রস্থ-গুহাশিল্প আরুগনেসীয় কালের হিমানী প্রবাহের পর বলেই মনে হয়।

John Cockburn, 'Joarnal of the Asiatic Society of Bengal' 1889, পত্রিকায় মীর্জাপুরের আদিম গুহাচিত্র সম্পর্কে লেখেন। ইনি 'Journal of the Royal Society' পত্রিকায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 'কেমুরের' পার্বত্য অঞ্চলের আদিম শিল্প সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। Bruce Foot 'বেলারী' ও 'কালাতে' গুহাচিত্রের নিদর্শন পান। 'বাগেলাখণ্ডে'র ও 'বুন্দেলখণ্ডে'র আদিম গুহাচিত্র সম্বন্ধে Carlleyleও লিপিবদ্ধ করেন। বান্দার গুহাচিত্র অন্যান্য গুহাচিত্র অপেক্ষা বেশী উন্নত ধরণের এই বিষয়ে Anderson জ্ঞাত করেন। ইনি রায়গড় অঞ্চলের সিংহলপুরে গুহাচিত্রেরও নিদর্শন পান।

প্রস্থ-কালীন অন্যদেশীয় গুহাচিত্রের সঙ্গে ভারতীয় আদিম চিত্রের বিষয়বস্তুর একটা ঐক্য বর্তমান। বাইসনের ছবি প্রায় সমস্ত আদিম গুহাচিত্রেই দেখা যায়। । কিংবা ক্যাঙ্গারুজাতীয় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর অথবা বাইসন নিধনরত আদিম মানুষের ছবি একটা বিশেষ উদাহরণ। সিংহনপুরের আদিম চিত্রের সঙ্গে অস্ট্রেলীয় ও তথাকথিত পূর্ব্ব স্পেনীয় চিত্রের মধ্যে একটা মিল আছে, বিষয় বস্তু, ও বিশেষ করে দৃষ্টিকোণ ইত্যাদির।

বেলারীপ্রদেশের 'কাপগুল্লার' গুহাচিত্রের প্রায় কুড়িটি পাখীরদলের ও বিভিন্ন জন্তু সমষ্টির বেশ ভাল নিদর্শন পাওয়া যায়। 'ওয়েনাদে'র 'একাডেল' গুহায় ক্ষীণ পাথর খোদাইএর মধ্যে মানুষের মাথায় অদ্ভুদধরনের অলংকরনের আভাষ দেখা যায়। 'একাডেল' গুহার কাজের সঙ্গে 'সংহনপুরের গুহাচিত্রে একটা সাদৃশ্য বর্তমান।

আদিমকালের এই ছবিগুলোকে পুরাতত্ত্ববিদেরা আদিম প্রকৃতি-ধর্ম্মী নাম দিয়েছেন। কারণ দ্বৈতজগত সম্পর্কিত জ্ঞান সম্ভূত জ্যামিতিক পদ্ধতির পরও যে এই আদিম প্রকৃতিধর্ম্মী চিত্র হয়নি তা নয়, কারণ আধুনিক চিত্রকালে হেনরী রুশোর নাম আদিম প্রকৃতিধর্ম্মী হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে যুগে এই সব আদিম ছবি আঁকা হয়েছে, যে যুগে আদিম মানুষের



এই অনুভূতির স্ফুরন দেখা দিয়েছে, সেই যুগে মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে, বিভিন্ন খেয়ালের সঙ্গে মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিধর্ম্মী হিসাবে বেড়ে উঠবে।

স্বতঃস্ফূর্ত্তভাব এই ছবিগুলোতে বর্তমান। যে কোন অনুভূতির তাড়নায় হোক না কেন আদিম মানুষ ছবিতে একটা আপন ইচ্ছার কথাকেই স্বাক্ষরিত করবার চেষ্টা করেছে। এই ছবিগুলোতে ভাবাবেগের কোন তাড়নাই নেই। মনের অন্তরলীন কোন আদর্শেরও এইগুলো নিদর্শন নয়, সম্পূর্ণভাবে এই শিল্পসৃষ্টি rational এবং আপন সৃষ্টিতেই স্বয়ং সম্পূর্ণ। শিশু শিল্পে এবং আদিম শিল্পের মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে মিল আছে। কারণ দুজনেই যে বিষয়বস্তুকে চাক্ষুষ দেখছে, তাকে ঠিক চাক্ষুষ দেখার মত করেই আঁকছে না—সেই বিষয়বস্তুর সম্পর্কিত, প্রকৃতিধর্ম্মী জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতাকেই লিপিবদ্ধ করে। Arnold Hauser, তাঁর 'The Social History of Art' বইতে বলেন…they give a theoretically synthetic not an optically organic picture of the object," কোন বাইসনের ছবিতে তাই সেই বাইসনকে আঁকা হয়েছে তার প্রকৃতি-পরিবেশের বিশেষ কোন সময়ের সম্পর্কিত জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে।

তিনরকম দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। সামনে থেকে পেছন থেকে ও ওপর থেকে দৃষ্টিপ্রসূত অভিজ্ঞতা থেকেই আদিম শিল্পী ছবি আঁকত। এবং সেই অভিজ্ঞতাকে আরও সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্যে শিল্পী সেই বিষয়বস্তুর পারিপার্শ্বিকের আবহাওয়াকেও ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করত না।

শিশু সুলভ মনের পরিচয়ই বর্ত্তমান। বৈজ্ঞানিক সুলভ মনের পরিচয় নেই বলে একটা স্বচ্ছতার আভাষ পাই। ছবিতে মাত্রাধিক্যতা নেই। শিল্পীর নিঃসঙ্কোচ মনের অভিব্যক্তি বেশ পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। কোন জটিলতা কিংবা কোন অলৌকিক প্রস্তাবনার কথা মনে জাগে না।

ভয়ের অনুভূতি থেকেই নাকি আদিম শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস। William Worringer তাঁর 'From the Problem of the Gothic' বইটিতে বলেন "…all primitive art arises from the emotiom of fear." কিন্তু সঠিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র ভয়ের অনুভূতি থেকে ছবি আঁকত এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে ঠিক কিসের জন্য এই ছবি আঁকা হয়েছে? শুধু কি ছবি আঁকার জন্যে ছবি আঁকা না ফাঁকা গুহাটিকে রং আর রেখায় ভরিয়ে একটা বিশুদ্ধ আনন্দ পাবার চেষ্টা, কিংবা কোন প্রয়োজনের তাগিদে এই সব ছবি আঁকা হয়েছে সেইটাও আলোচ্য।

আলোচনা করলে দেখা দেখা যায় যে আদিম মানুষ যখন এই ছবিগুলো এঁকেছে তখন তার চারপাশে হিংস্র প্রকৃতি আর বন্ধ্যা পৃথিবী। একটা নিরবলম্ব, সম্পূর্ণ একক অনুভূতি নিয়ে এই প্রস্থ-মানব কাল কাটাত। সেখানে সমাজ জীবন, কিংবা দেবতার অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণ-ভাবে হাস্যকর। তবে তখন কি এই ছবি আঁকা হত জীবন ধারণের উপযোগী বৃত্তি হিসাবে, হয়ত কোন প্রয়োজনের তাগিদে এই সব ছবি আঁকা হত আর এই উপযোগী ছবি এঁকে আদিম

মানুষ কিংবা শিল্পী নিজেকে হিংস্র প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখত। এবং পরবর্ত্তীকালে এই ছবি আঁকিয়ে সম্প্রদায়ই যাদুকর পুরোহিত হিসাবে নিজেদের কর্তৃত্ব করতে সুরু করে।

তবে একথা ঠিক যে ছবিতে ধর্ম্মের অস্তিত্ব জানিয়ে অলৌকিক কিছুর সমাবেশ করা হয়নি। শুধুমাত্র শিকারী জীবনের ওপর একটা যাদুকরী প্রভাবকে কাজে লাগানোর জন্য এই ছবি আঁকা হত। এবং এই যাদুকরী প্রভাবের সঙ্গে ধর্ম্মের কিংবা ধর্ম্ম সম্পর্কিত কোন অনুষ্ঠানাদির সংযোগই ছিল না।

কোন বিষয়ে যাদুর প্রভাব দেখানোর জন্যে ছবি আঁকা হলেও সেই যাদু কোন বাস্তব বস্তুকে অবলম্বন করেই হতো, সেখানে অলৌকিক কোন শক্তির প্রতি আস্থাভাজন হ'বার জন্যে এই যাদুছবি আঁকা হতো না। কারণ ছবিতে mysticism এর অস্তিত্ব নেই। হিংস্রপ্রকৃতিকে তার জন্তুরাজ্যকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে আনবার চেষ্টা এই আকাঙ্ক্ষা থেকে এই ছবির সৃষ্টি। নিজের শক্তির বিশ্বাসকে আদিম মানুষ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে জন্তুরাজ্যের ওপর। তাই খাদ্য সংস্থানের চেষ্টায় যখনই তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে প্রাণপাত করে। তখনই সে যুদ্ধে জয়ের আশায় এই ছবির যাদু দিয়ে হিংস্র জন্তুরাজ্যকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে।

আদিম মানুষ ছবি এঁকেছে, পাথরের গায়ে জন্তুর মূর্ত্তি খোদাই করেছে নিজেকে জীবন যুদ্ধে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। নিজেকে পোষণ করার ইচ্ছা রূপান্তরিত হয়েছে যাদুকরী ছবিতে। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত যে এই ছবিগুলো যাদু করবার বিভিন্ন প্রকরণ, এইগুলো এক একটা বিশ্বাস আহরণের অস্ত্র। ছবিগুলো পরোক্ষভাবে এক একটা ফাঁদ বা যে ফাঁদে সে জন্তুদের আগেই নিহত করে নিচ্ছে যাদু ছবি এঁকে। তারপর শক্তি পরীক্ষায় জয় অবধারিত ভেবে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জন্তুর ওপর। এই ধরণের খানিকটা ব্যাপার আমরা ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রের মধ্যে পাই।

এই ছবিগুলো দেখলে আদিম মানুষের মনস্তত্ব বেশ সহজভাবেই বোঝা যায়। প্রথমতঃ সে চায় খাদ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, আর সেই খাদ্যও খুব সুলভ নয়, যার জন্যে তাকে করতে হবে যুদ্ধ, এই বাসনার প্রথম স্বাক্ষর তার ছবি। যেখানে আদিম মানুষ তার আরও দলবল নিয়ে বাইসনকে বর্শা বিদ্ধ করেছে। বাইসন নিধন যজ্ঞ সে নিজেই একবার করে নিচ্ছে পাথরের গায়ে, প্রকৃত বাইসনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার আগেই ছবি আঁকবার পর আদিম মানুষ ভাবত যে অঙ্কিত জন্তুর বা বস্তুর ওপর তার যাদুর প্রভাব সার্থক হয়েছে, তার ওপর নিজের বাহুবল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাল ও পাত্র শুধু ভিন্ন স্থানের, এছাড়া আদিম মানুষের কাছে অঙ্কিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তব জঙ্গলের জন্তু-নিধন পর্বের কোন তফাৎ নেই। ছবিতে আঁকলেই তার এই বিশ্বাস জন্মে গেল যে জন্তুটি প্রকৃতভাবে নিহত হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত, Sioux Red Indianদের মধ্যে বাইসনের ছবি সম্পর্কে এই রকম ধারণা আছে। আধুনিক কালে অনেক আদিম জাতির মানুষে বিশ্বাস করে যে তাদের কোন প্রতিকৃতি কিংবা প্রতিচ্ছায়া নিলেই তারা নিশ্চয় খুবই তাড়াতাড়ি নিহত হবে। এই চিন্তার জনক আদিম গুহামানব।



এই বাস্তব আর বাস্তব অনুসরণে ছবি এই দুটোর মধ্যে কোন অমিল এই গুহা মানব খুঁজে পেত না। সেই কারণে বাস্তব বাইসন আর ছবির বাইসন একই বলে মনে হতো। ছবি আঁকা মানেই হলো বাইসনটা আবার আদিম শিল্পী নতুন জীবন দিয়ে আঁকল। তাই এই ধারণার প্রতিধ্বনি আমরা পাই pygmalion উপকথায়, যেখানে শিল্পী নিজের তৈরী মূর্ত্তির প্রেমেই মসগুল। কারণ প্রকৃত নারীদেহের সঙ্গে পাথরের নারীদেহের কোন অসাদৃশ্য ছিল না। যে কারণে শিল্পী ওই নির্জীব নারীমূর্ত্তিকে সজীবভাবে প্রেম নিবেদন করেছে। আরও অগ্রসর যুগে এই ধারণার মার্জিত রূপ দেখি জাপানী আর চীনা ছবিতে। সেখানে শিল্পী কেবলমাত্র কোন বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করেছেন, কিংবা নিজের idealizationকেই যে শুধু রূপ দিয়েছেন তা নয়, শিল্পী নিজের জীবন দর্শনের কোন সংস্কার কিংবা কোন নতুন রূপকে ছবিতে এঁকেছেন।

চৈনিক উপকথায় শিল্পীর সঙ্গে শিল্পবস্তুর একটা আন্তরিক যোগসূত্র লক্ষণীয়। একটা পরীর দেশের গল্পে আছে যে কোন জীবন্ত মানুষ আঁকা ছবির মধ্যে হেঁটে চলে গেল কিংবা রাজকুমারী ধীর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলেন বাস্তব জগতে।

আদিম মানুষের ছবিগুলো সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির আড়ালে আঁকা। অধিকাংশ ছবি গুহার অন্ধকার অংশে প্রায় বিলুপ্ত। আর এছাড়াও এটা লক্ষ্যণীয় যে, গুহার সমগ্র দেওয়াল জুড়ে ছবি নেই। বিশেষভাবে একটা অংশেরই ছবি আঁকা হয়েছে। এবং সেই অংশটি বেশ অন্ধকার। গুহা সজ্জার তাগিদে নিশ্চয়ই ছবি আঁকা হয়নি। আরও একটা ব্যাপার যে একটা ছবি আঁকার পর তার ওপরে আবার ছবি আঁকা হয়েছে। মনের aesthetic ভাবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেও নিশ্চয়ই এভাবে ছবি আঁকার প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া অন্য কোন ভাবানুভূতির বশবর্তী হয়ে ছবি আঁকা হয়নি। গুহার একটি বিশেষ অন্ধকার জায়গা বেছে নেওয়ার পিছনে একটা উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত যে এই বিশেষ জায়গাটিই যাদু করবার উপযোগী। এ পবিত্র স্থানটি যাদুকরী প্রভাব আনয়নকারী—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে আদিম মানুষ একই জায়গায় ছবির পর ছবি এঁকে গেছে কিন্তু এইজন্যে এই বিশ্বাস হতে পারে না যে এই যাদুকরী শিল্পে aesthetic কিংবা ধর্ম্মভাবাপন্ন ভাবের আভাষ আছে। এই যাদুকরী ব্যাপারটাকে 'জন্তুমারাকল' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই যাদুতে যোগসূত্র আছে বাস্তব বস্তুর সঙ্গে। অলৌকিক শক্তির সঙ্গে কোন যোগ নেই।

কোন কোন গুহাতে মানুষের মাথায় অদ্ভুত অলংকরণের বা বিশেষ কোন সজ্জার আভাষ দেখা গেছে। এখনও আদিম জাতের মধ্যে যাদুপ্রভাব আনবার জন্যে জন্তুর পোষাকের নকল করে যাদুকরী নৃত্যের ( magical miming dance ) প্রচলন আছে। তাই এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে এই গুহা শিল্প সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী-যাদুকরী-শিল্প।•

---

বাস্তববাদী যাদুকরী শিল্প সম্পর্কে, H. obermaier এবং H. Kuehn, 'Bush man art' 1930 p. বইতে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। M. C. Burkitt তাঁর বই Prehistory p, p. 309—13 এই বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

ভয় কিংবা অন্য কোন অনুভূতির বশবর্তী হয়ে আদিম শিল্পী ছবি আঁকেনি বলে আমরা এই সমকালীন প্রকৃতিধর্মী সম্পূর্ণ naturalist ছবি দেখতে পাই।

এই যাদুকরী যুগ ছাড়া আরও একথা পূর্ব্ব-যাদুকরী যুগের আভাষ আদিম শিল্পে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব যাদুকরী যুগে মানুষ যাদুকরী শিল্প সম্পর্কে পরীক্ষা করে চলেছিল। পরবর্তীকালে যাদুতে মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি ছবি-যাদুর পরেই আসে, কারণ ছবি-যাদুযুগে ছবিটিই একটি সম্পূর্ণ একক যাদুকরী প্রভাব আনয়নকারী ছিল। যেহেতু বাস্তব বস্তুর ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য যাদুর সাহায্য নেওয়া হতো, সেইজন্য বস্তুটি যাদুর একটি অঙ্গ ছিল। যে কারণ বাস্তব বস্তুটির একটি সঠিক অনুসরণে চিত্র—ছবি, যাদুর একটি অপরিহার্য বস্তু বলেই পরিগণিত হতো। তাই মানুষ তখন এই বাস্তব বস্তু আর তার অনুকরণে আঁকা জীবনহীন বাস্তব বস্তু এই দুটোকে আবিষ্কার করল তখন থেকেই যাদুর উদ্ভব। ছবি এঁকে বাস্তব বস্তুর নকল, মানেই আসল বস্তুটির সমস্তটাই আবার পরবর্তী সৃষ্টি, এই বিশ্বাস যুগে যুগে ছিল। যার কারণে আসল বস্তু ( original ) এবং নকল ( Copy ) দুটোর মধ্যে মিল মানুষ আবিষ্কার করে এই যাদুকরী শিল্পের উন্মেষ ঘটাল। এই সাদৃশ্য বোধ আর অনুকরণ যা কোন কিছু না দেখে আঁকার প্রচেষ্টা, যার থেকেই আজকের যুগের Creative শিল্পের জন্ম। পূর্ব্ব যাদুকরী যুগের কয়েকটি হাতের ছায়ার নকল দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এইগুলো সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ছবি। এতে করে আদিম শিল্পী বুঝতে পারে যে আসল বাস্তব বস্তু নিষ্প্রাণভাবে নকল করা বস্তুতে রূপ নেয়। এই নকল আসল বস্তুটিকেই প্রতিভাত করছে। যদিও অনুভূতির জ্ঞান আর যাদু শিল্পের যুগের প্রস্তাবনার মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ফারাক।

আদিম যে মানুষ ছবি আঁকাতে ক্ষমতা পেয়েছে সে মানুষের কদর যাদুকর শিল্পী হিসাবে নিশ্চয়ই হতো। কারণ এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই যাদুকর শিল্পী গোষ্ঠী পরে যাদুকর পুরোহিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যদিও খাদ্য সংগ্রহের কাজটা অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল আর দুর্লভ ছিল, তাও এই যাদুকর শিল্পী গোষ্ঠী নিশ্চয়ই এই শ্রমসাধ্য কাজ থেকে বিরতি পেত। কারণ এরা হিংস্র জন্তুর ওপর যাদুপ্রভাব আনতে সক্ষম ছিল বলে।

প্রত্ন-মানবীয় গুহাশিল্প সর্ব্বত্র একই মানের নয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানের। উন্নত ধরণের শিল্প প্রচেষ্টারও লক্ষণ পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে। আদিম গুহাচিত্র পরীক্ষা করে Fakab Strieder বলেন যে উন্নত ধরণের গুহাশিল্পের জন্য আদিম শিল্পকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো। এ বিষয়ে ইনি লিপিবদ্ধ করেছেন, The many 'Sketches' 'rough drafts' and corrected 'pupils', drawings, which have been found along side the other surviving pictures এ ছাড়াও তিনি এও উল্লেখ করেন যে……there was an organised educational activity at work, with schools masters, local trends, and traditions নানা ধরণের নানা দৃষ্টিকোণের বিভিন্ন মানের ছবি এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। এছাড়াও neolithic কালে সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প প্রচেষ্টার মূল এতে খুঁজে পাওয়া যায়।

# আলোচনা

## পাঠকের চোখে—সাম্প্রতিক বাংলা পুস্তক সমালোচনা।

সাহিত্যক্ষেত্রে বা মানসিক শিল্পকলামন্দিরে 'শ্যালারটনিজম্' কদর পেতে পারে কিনা—এ সম্বন্ধে ভাবিত হয়ে কোবিদ ফরাসী সমালোচক Saiute Beauve বলেছিলেন, এ বিশেষ ধরণের অনাকাঙ্ক্ষ ধর্ম্মটি রাজনীতি বা সামাজিক সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মে লালিত হতে পারে। "But in the Order of thought in art. the glory, the eternal honour that Chalartonism shall find no entrance" বিশুদ্ধচিত্তে অনিত্যমতিবর্জ্জিত ভঙ্গীতে যে এ বিশেষ কথা তিনি বলতে পেরেছিলেন তার কারণও রয়েছে। শিল্পকলাক্ষেত্রে যারা সেবাব্রতীর নিষ্ঠা নিয়ে আসবেন—তাদের ব্রতের প্রতি সহনশীল আর সাধনগভীর বিশ্বাসের ওপর তিনি আস্থাবান ছিলেন। শিল্পকলাক্ষেত্রের আন্তরিক ধর্ম্মাধর্ম্মের গভীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যে কেউ অন্তরঙ্গভাবে আত্মীয়তা বোধ করবেন—তিনিই একবাক্যে এ ধরণের রম্যধারণাকে অভিনন্দন জানাবেন।

এ রম্যধারণা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে, যদি শিল্পকলার পূর্ণতাসমৃদ্ধ ঋদ্ধি আনার কথাকে কাম্য জ্ঞান করি আর ধ্যানবস্তু মান্য করি। শিল্পচর্চ্চা প্রকৃতপক্ষে স্বভাবকুশলী ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভাগ্রাহ্য ব্যাপার। বাহ্যিক রংবেরঙের চেয়ে, আন্তরিক বিশ্বাস ও ব্রতের প্রতিই শিল্পধর্ম্মের গতি, ঝোঁক আর প্রেরণা। তা-ই বলে বাইরের একটা সুস্থির আর সুপরিপক্ক পথ নির্দ্দেশ এ-ধর্ম্মের অনুশীলনে খানিকটা প্রাণ-তরঙ্গের সৃষ্টি করবেনা—এমন কথা বলা হল না। শিল্পীর আপনভোলা মনের স্বাভাবিক আবেগবাহী ধারণা বাইরের আবশ্যক বাহবা, সেবা চায়। এ সেবার পথ রস-ভোক্তাদের পছন্দ-অপছন্দের সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত। পছন্দ অপছন্দের আবশ্যক ব্যাখ্যান, রসস্রষ্টা চান, রসবেত্তার আন্তরিক ও স্বকীয় হতে হবে। তবেই শিল্পীর স্বাদ ও রুচিতে বেশ কিছুটা আত্মদর্শনের বা আত্মসমালোচনায় নিষ্ঠা আসবে। তাতে হয় কি শিল্পীর কর্মপ্রেরণায় সম্যক্ সফলতা আসতে পারে। শিল্পকর্ম্মের মূল্যায়ণে যদি সমালোচক বেগতিক বুদ্ধির বাহারে নিজেকে লুক্কায়িত রেখে সমালোচনার তূণীর থেকে বাণ ছুঁড়তে থাকেন ( যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হাতুড়ে দাওয়াই-এর পরিণতির সঙ্গে একাত্ম ) তাতে মূলধর্ম্ম ও মূলকর্ম্ম হতে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়েন। এতে হয় শিল্পীর সদাসদজ্ঞানে খানিকটা দোদুল্যমানতার সৃষ্টি। এ ভীষণ মারাত্মক। শিল্পকলার খতম সেখানেই সাধন হয়। এ 'শ্যালারটনিজম্'-এর কৌশল অবক্ষয়ের চিহ্নকে গভীরভাবে রেখায়িত করে।

সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনার ধরণ-ধারণ, কলাকৌশল আর অন্তরালবর্ত্তী রহস্যের আভাসে আমার মত সাধারণ পাঠকরা বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন বলেই উপায়ের এতগুলো কথা মাথায় এলো। নীচে কতকগুলি অসংগতি আর অনুদার বাক্‌জালের নিমিত্তি

কৌশলের কিছু কিছু আলোচনা সত্যানুসন্ধানের জন্যে করা গেল। এ আলোচনা করতে গিয়ে আমার বক্তব্যের যে যে কেন্দ্রবিন্দু তৈরী হল, তা হচ্ছে—বাংলা সাহিত্যের এ বিভাগে স্ক্যালারটনিজম্ ভর করেছে। উপযুক্ত স্থান থেকে এ সম্বন্ধে যথাযোগ্য পথনির্দ্দেশ এলে, বিভ্রান্ত পাঠক উপকৃত হবেন।

॥ ২ ॥

যে যে লক্ষণাক্রান্ত হয়ে এ আলোচনার উদ্ভব—তা একে একে বিশদীকরণের অপেক্ষা রাখে।

প্রথমতঃ, মতবাদবিশেষের নিকট মাথা বিক্রী করে ফেলেন অনেক সমালোচক। উপলব্ধির বদলে ফর্মূলা, অন্তরঙ্গতার বদলে কৃত্রিমতা, অনুরাগের বদলে অনিচ্ছুক আত্মীয়করণ প্রবণতা—এগুলো যেন তাদের কাছে বড়। গোষ্ঠিগত, অতএব মতবাদবিশেষের স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ ফারাক—এ গণতান্ত্রিক যুগে অবশ্যই সম্ভাব্য। সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূত ধারণার সঙ্গে সমালোচ্য বস্তুর বিচারণা—এ দুয়ের মধ্যে একটা সাহিত্যধর্ম্মী সাযুজ্য থাকা রীতিমত দরকার। বিশ্বা, বুদ্ধি উপলব্ধিকে কোথায় তলিয়ে দিয়ে মতবাদের একটা মাদক-প্রবাহ মোহমুগ্ধ করে ফেলে। মতবাদ বিশেষের অধীন পরাধীনতায় মতো ক্লেদাক্ত গ্লানি আর কোথাও মেলে না। তখন, জীবন যে একটা বলিষ্ঠ অভিজ্ঞতার প্রাণবন্ত আধার এ বিস্মৃত হতে হয়। সুতরাং সৎসমালোচককে জীবনের অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া ব্যক্তি হতে হয় আর তাকে অন্যের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজে চেখে দেখে নিতে হয়। এ নইলে বৃথাই সমালোচনা। এ দৈন্যতার উৎস হচ্ছে মতবাদের প্রাবল্যের নিকট আত্মসত্তানিবেদন। অতি সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাতাহাতির খবর যারা রাখেন, তারা নিশ্চিত হবেন এ দৈন্যতার আবিষ্করণে। আর আশঙ্কিত ত বটেই! চিন্তার আর বুদ্ধির স্বকীয়তা এবং মতবাদপ্রভাবিত পন্থায় জীবন-ধারণা পদ্ধতি এ দুয়ে বিস্তর ফারাক। আসমান জমিন ফারাক বললেও চলে।

দ্বিতীয়তঃ, আরেকধরণের লজ্জাকর লক্ষণাক্রান্ত দুর্বলতা সমকালীন একধরণের সমালোচকদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তা হচ্ছে: সঙ্কটকালে সুবিধাবাদের (Emergent Evolution) বর্ম পরিধান। এধরনের সমালোচকের মধ্যে দুটো দল আছেন। যারা মতবাদ অধ্যুষিত গোষ্ঠী-পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত আর যারা নিজেদের অনুপযুক্ততার ফাঁককে বাইরের গুরুগম্ভীর ভারিক্কী মন্তব্যের পোষাকে অন্তরাল করতে তৎপর। বাংলা পুস্তক সমালোচনার এধরনের নিম্নমার্গীয় চেষ্টা দেখে শুভচেতনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাশ্বেতা বোধহয় নিজের লজ্জা ঢাকবার জায়গা খুঁজে পান না। 'এমার্জেন্ট ইভ্যুল্যুশনের' বর্মপরে কোন সদ্ সমালোচনা সম্ভব নয়। এতে সমালোচ্য লেখক সমালোচকের তারিফ কৌলিন্যে আনন্দিত হতে পারেন, অজ্ঞ সমালোচক নিজের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি আর আত্মকাঠিন্যে পুলকিত হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের তাতে বিপদ বাড়ে।

তৃতীয়তঃ, সমালোচকের লেখনীধারন অনেকটা সমাজ-বিপ্লবীর কাজের মত। সমাজ-



বিপ্লবী সব্যসাচী। তার এক হাতে ময়লা সাফ হয়। জীর্ণতা খসে পড়ে। যা কিছু একান্তই লুপ্ত হওয়ার মত, ধ্বসে পড়ে। অন্য হাতে নতুন আর নিটোল সৃষ্টি জন্ম নেয়। একাজে অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস আর অশ্লীল অন্ত্যজ রিপু ক্রোধ—দুই অসংগত আর অপ্রবেশ্য। যদি কারো কোন কিছু ভাল লাগে তবে তা একচক্ষুর উজ্জ্বল্যে সৌরভমণ্ডিত না করে অন্য চক্ষুর অগ্নিতে পুড়িয়ে পিটিয়ে শক্ত করে নিজের আসল বক্তব্য বা মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত। তেম্নি মন্দ-লাগার ব্যাপারটারও সুফল সুরাহা হওয়া দরকার। বিশেষ করে প্রতিশ্রুতিসংবাদী তরুণ লেখকের বেলায় সর্ব্বসংস্কার মুক্ত সমালোচনাসহ দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু এ উভয় মহৎ ও জরুরী গুণের কথা বিস্মরণ করেন বলে অনেক সমালোচকের কাছে কোন বইয়ের না অন্ধ দিক না আলোকিত দিক-কোনদিকই পরিষ্কাররূপে ধরা পড়েনা। এর মস্তবড় কারণই হচ্ছে ব্যক্তিগত আবেগের পরিমণ্ডল অতিক্রম করে বহির্জগতের রৌদ্রগন্ধস্বাদ পেয়ে পুষ্ট হতে চান না সমালোচক। ফল অস্বাস্থ্যকর হয়। আত্মপছন্দ-অপছন্দের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যানকৌশলে মুখর হন তিনি। তার সংগে আবার যদি আবেগের শিথিল অশ্বরাস যুক্ত হয়, তখন সে সমালোচক আর সত্যিকারের সংজ্ঞায় সমালোচক বলে গণ্য হতে পারেন না। আত্মরতিবিমুগ্ধ এক ধরণের বল্গাহীন রসভোক্তা হয়ে পড়েন তিনি। আদতে যার বক্তব্যের কোন মূল্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। এ শ্রেণীর সমালোচক আজকাল বেশ চোখে পড়ছেন।

চতুর্থতঃ, পরস্পর পিঠ চাপড়ানি। এ একটা সাংঘাতিক দুষ্ট ব্যাধি। বেকন বলেছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ শত্রু! কথাটা সর্ব্বাংশে সত্য। সত্যতা বহির্ভূত হয়ে, বিরাট দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে, নিষ্ঠা আর ব্রতচ্যুত হয়ে একধরণের সমালোচক দেখা দিয়েছেন—যাদের মধ্যে এবম্প্রকার ব্যাধি অতিপ্রচলিত। আজিকার নৈরাশ্য-প্রপীড়িত সাহিত্যক্ষেত্রে যখন সাহিত্যিকের আর্থিক দুরবস্থার চূড়ান্ত, সেখানে এধরনের পারস্পরিক পিঠচাপড়ানির অভ্যাসকে কতখানি ক্ষমার চক্ষে দেখা যায়, তা প্রতীক্ষমননে বিচার্য্য। যতদূর মনে হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যায় আতিশয্যের ব্যাভিচারকে লালিত হতে না দিয়ে মাত্রাপরিমিত দাক্ষিণ্যের অনুমোদনেই প্রকৃত সহমর্মিতা প্রকাশ পায় সমালোচকের সমালোচ্য সাহিত্যিকের প্রতি। আর্থিক দুরবস্থায় কান্নাকাতর সাহিত্যিকের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ রয়েছে অবশ্যই। কিন্তু অনাবশ্যক অসংগত আর রহস্যজনক পিঠচাপড়ানির মধ্যে সুস্থতার শুভ্রতার আর সৌন্দর্য্যের দেবী নিদারুণ দুঃখ পান। এতে হয় কি, নিষিদ্ধ আর অনুমোদনের অনুপযুক্ত পরিশ্রমকে আদর জানান হয়। পাঠক এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অনর্থক তার হয়রানি বেড়ে যায়। সমালোচক যদি 'সেলসম্যান' হন, তবে দেবী মহাশ্বেতা লক্ষীর আধিপত্যে বিশেষ রুষ্ট হন।

পঞ্চমতঃ কবিগুরু বলেছেন 'লেখকের মনের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য্য। যেখানে সৌন্দর্য্য এবং শান্তি নেই, সেখানে প্রকৃত সাহিত্য নাই।' কথাটা নিজেতে নিজে পূর্ণ না হলেও এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সমালোচনার বহুবিধ করনীয় উত্তম কাজের মধ্যে অন্যতম একটি মহৎ দরকারী বস্তু। নিপুণ ডুবুরীর মত গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা

সংগ্রহের মত সমালোচকও আলোচ্য পুস্তকের গভীরে চলে যাবেন! সেখান থেকে যাবতীয় রত্নবিশেষ উদ্ধার করে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন। পাঠক তখন জ্ঞাত হবেন, সতত হবেন। অধুনাতম মাসিক ত্রৈমাসিক সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রের পৃষ্ঠায় এধরণের সমালোচনা কর্মের ছিটেফোঁটা দৃষ্টান্ত চোখে পড়লেও সবটাই নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের গালভরা উদ্ধৃতির সুপ্রচুর ব্যবহার্য্যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের একটা ছেলেমানুষী ঝোঁক অনেক সমালোচকের মধ্যে লক্ষিত হয়। তিনি নিজের বিশিষ্ট দায়িত্বের কথা বিস্মরণ করে কেমন জানি অনর্থক অস্পষ্ট পাণ্ডিত্যের মোহের কবলে পড়ে যান। সে মোহমুগ্ধ ভাবের রেশ কেটে গেলে তিনি নিজেই নিজের অফলা আর অকর্ম্মণ্য আলোচনার ধরনধারন দেখে লজ্জিত হবেন। কিন্তু সে মোহের ভাব কাটেনা কোনদিন। Intellectual Honesty নাকি আজকাল বেড়ে যাচ্ছে—একথা কেউ কেউ বলেন। আমরা সাধারণ পাঠকরা কিন্তু এর বিন্দুমাত্র হদিশ না পেয়ে দিন দিন ভড়কাচ্ছি। আপ্তবাক্যকে ব্রহ্মবাক্য বলে শিরোধার্য্য করতে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না একথা-ও অনেকে বলেন। উদ্ধৃতির ব্যবহারে যেরকম একটা মহড়ার ভাব দৃশ্য হচ্ছে তাতে সে কথা বিশ্বাস করা যায় কি করে? আলোচ্যবস্তুর আত্মসাতীকরণই যদি না হয় তবে সমালোচনাই বা কি করে করেন বা করতে সাহস পান সমালোচক? তখন উদ্ধৃতির প্রাবল্যে কি সমালোচনা সার্থক হয়? প্রথমে সূক্ষ্মধর্মী উপলব্ধিতে আত্মসাৎ, পরে বিশ্লেষণ আর তুলনামূলক আলোচনা। তখন আপ্তবাক্যের কিছু কিছু উদ্ধৃতির দরকার হয়। যার যথার্থ লক্ষ্য হবে—সদ্ মূল্যায়ন। সোজা কথা, পশ্চিমী সাহিত্যিকদের অবিশ্লেষে, উদ্ধৃতি আর অনাবশ্যক যখন তখন যেখানে সেখানে উদ্ধৃতির সাহায্যে অনায়ত্ত উপলব্ধিকে ঢাকা দিয়ে কোন সার্থক সমালোচনা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠতঃ, আরো একটা গ্লানিকর পদ্ধতি বেরিয়েছে—যা দেখে আমাদের বিশেষ বিমর্ষ বোধ করতে হয়। প্রবীণ আর খ্যাতনামা সাহিত্যিকের দু'লাইন সুপারিশ সমালোচনার মতো বিরাট সংজ্ঞা নিতে চলেছে। এধরণের ঘরোয়া স্নেহ বিতরণের সংগে সামাজিক সাহিত্যের মিতালী সাহিত্যের ভবিষ্যতে সংকটাপন্ন সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে। এরকম হলে সাহিত্যের অন্তর কিসে আস্থাবান হতে পারে?

॥ ৩ ॥

পুস্তক সমালোচনার ক্ষেত্রে উপরি-নমুনার বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি দর্শন করে পাঠক সম্প্রদায় হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়েন। এবিষয়ে সতর্ক পাঠক আর সাহিত্যের আন্তরিক শুশ্রূষু-সাধকের দৃষ্টি পড়লে ভাল হয়। এতে ঘোলা জল সাফ হবে। হবে ঝকঝকে তকতকে আয়নার মত নির্মল। যে আয়নার সাহিত্য নিজের যথার্থ চেহারা দর্শন করে সংকটমুক্ত হবার সাধনা করবে।

পবিত্র পাল

## সমাজসমস্যা

### বাঙালীর পরিচ্ছদ (২)

বিদেশী পোষাকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময় আমাদের হয়ত এই কথাটা মনে থাকেনা যে স্বদেশী পোষাক বলে বিশেষ কোন পোষাককে চিহ্নিত করা আমাদের দেশে সম্ভবপর নয় *। তা ছাড়া ধুতি চাদরের যুগ যে শেষ হয়ে এসেছে, এ লক্ষণ স্পষ্ট। তবে কি পাশ্চাত্যের কোট-প্যান্ট-টাই এদেশে চালু হবে? হয়ত তাই, কিম্বা হয়ত উত্তর প্রদেশে প্রচলিত পোষাক, অর্থাৎ নেহেরুকে সচরাচর যে ধরণের পোষাকে দেখা যায়—সেই রকম কোন পোষাক সারা ভারতের মত বাংলাতেও প্রচলিত হবে †।

যাই হোক, আমাদের পোষাক কি জাতীয় হওয়া উচিত এই মীমাংসার আগে পোষাকের প্রচলন কিভাবে হয় মানুষ আদৌ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে কেন সেই বিষয় সামান্য আলোচনা চলতে পারে।

মানুষ পোষাক পরে কেন?—আপনি বলবেন, এ ত অতি সহজ কথা,—লজ্জা নিবারণ করার জন্য। অন্য কেউ হয়ত তার সঙ্গে যোগ করে বলবেন, শীতাতপ থেকে শরীরকে রক্ষা করাও একটা কারণ বটে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি উত্তর সহজগ্রাহ্য হলেও মূল কারণ অন্য। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞান কোন প্রশ্নই শুধুমাত্র প্রচলিত ধারণার উপর ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। পরিচ্ছদও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। পরিচ্ছদের ইতিবৃত্ত নিয়েও অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে।

বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক westermark অসংখ্য উদাহরণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরিচ্ছদের সূত্রপাত ঘটেছে যৌন আকর্ষণের উপায় স্বরূপে*। সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকেই এ বিষয়ে westermarkকে সমর্থন করেন †। যৌন আকর্ষণ ছাড়াও সামাজিকভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় অথবা বিশিষ্ট করে তোলার মনোভাবও যে পরিচ্ছদের সূত্রপাতে অবর্ত্তমান ছিল এ কথা জোর করে বলা চলে না ‡। দক্ষিণ আমেরিকায় বোরোরো উপজাতির মধ্যে সর্দ্দার অথবা সমাজে যে যত উচ্চপদস্থ, তারা মাথায় মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ প্রচুর পাখীর পালক ইত্যাদি গোঁজে—

---

* 'সমকালীন' মাঘ সংখ্যা (১৩৬৩) দ্রষ্টব্য।

† আমাদের আলোচনা আপাতত নাগরিক পুরুষের পরিচ্ছদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মেয়েদের পোষাক এখনও ঠিক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি—এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত।

* Edward Westermark—History of Human Marriage.

† '. . . such races as go naked, are by no means deficient in modesty, and the first garments worn were perhaps used in erotic dances as a means of excitement' (Quentin Bell—On Human Finery, 1947).

‡ "The impulse towards decoration is the most constantly recurring motivation in the history of clothing . . . . . . the one which is found also among higher apes" (Ency. of Social Sciences. Dress).

যে যত উচ্চপদস্থ তার আভরণ তত সংখ্যাধিক। নারী পুরুষ কেউই অধোবাস পরে না। নারীরা সম্পূর্ণ ই উলঙ্গ থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ উপজাতিই যৌনপ্রদেশ আচ্ছাদন করার বিষয়ে কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনা, কিন্তু সামাজিক মর্যাদাজ্ঞাপক পালক ইত্যাদি ব্যবহার সম্বন্ধে সদা জাগ্রত। অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে Ruth Benzel বলেছেন, "chief function of ornament is display either sexual or social ( Eneyclopaedia of social sciences—Ornament )। পোষাক সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

Frazer এবং Karsten প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মনে আবার পরিচ্ছদের সূত্রপাত ঘটেছে ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার ( magic ) মাধ্যমে। একথা আমাদের মোটামুটি জানা যে সভ্যতার সূচনায় মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শস্য এবং বংশবৃদ্ধি। এই দুই উদ্দেশ্যে আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক সবরকম ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সাহায্যই সে নিত। একদিকে যেমন অনুকৃতিমূলক ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার ( imitative magic ) সাহায্যে ফসল বাড়াবার চেষ্টা ঘটেছে, তেমনি সুফল-প্রতীক বিভিন্ন জিনিষ দেহে ধারণ করে বংশবৃদ্ধির আশা করা হয়েছে ; আবার অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকেও দেহকে, বিশেষভাবে জননেন্দ্রিয়াদিকে রক্ষা করার চেষ্টায় অঙ্গ বিশেষকে আচ্ছাদন করার প্রচলন ঘটে ( James Frazer—'Totemism and Exogamy' )। এই মতের সমর্থনে অসংখ্য তথ্য ক্রমবর্দ্ধমান। নানা রকমের কবচ, কুণ্ডল, ইত্যাদির ব্যবহার ( অলঙ্কারের আদিরূপ এইসব কবচ কুণ্ডলের মধ্যে স্পষ্ট ) ছাড়াও শরীরে ভস্মাদি লেপন, বিভিন্ন চিহ্ন, পূত বস্ত্রখণ্ড বা অন্য বিভিন্ন জিনিষ ধারণ প্রায় সব স্থানেই কোন না কোন যুগে প্রত্যক্ষ। এই সবের ব্যবহার নিঃসন্দেহে ইন্দ্রজাল-মূলক। J. C.Flugal'ও মোটামুটিভাবে এই মতের সমর্থন জানিয়ে আবার অন্য আর একটি দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—"......in general the earliest forms of art served utilitarian (*i.e.*, magical) rather than purely æsthetic ends. If this is true with regard to clothes, it may be said that the motive of decoration in dress, in its earliest manifestations, gradually grew out of the magical utilitarian motive in much the same way that in later forms of art, instruments and other objects, originally constructed to serve some useful purpose, became decorative, and eventually, in certain cases, persisted as decorations" (J. C. Flugel—The Psychology of clothes, 1930).

সজ্জাস্পৃহাই যে আধুনিক ফ্যাশনে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিচ্ছদের সূত্রপাতে ফ্যাশনের কোন প্রভাব আদৌ ছিল কিনা সে প্রশ্ন মীমাংসা-সাপেক্ষ ( আমাদের ধারণায় ফ্যাশন একান্তই সভ্যতার আধুনিক অবদান, প্রাচীনকালে ফ্যাশনের অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। অন্তত পোষাকে ফ্যাশনের প্রভাব প্রধানত রেনেশাঁসের পর থেকেই অনুভূত ), কিন্তু বর্ত্তমানকালে পোষাকের উপর ফ্যাশনের প্রভাব যত গুনিবার তত আর কিছুই ছিল না। বর্ত্তমান যুগে পোষাকের গতিপ্রকৃতি প্রধানত ফ্যাশনই নিয়ন্ত্রিত করে একথা মনে রাখলে আমাদের আলোচনার সুরাহা হবে।



পরিচ্ছদের প্রবর্ত্তনে অবশ্য শীতাতপ নিবারণ প্রচেষ্টাও অংশত দায়ী হতে পারে, তবে তা যে প্রধান নয় সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। শীতপ্রধান অনেকস্থানেই আদিম অধিবাসীরা অর্দ্ধনগ্ন বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে ( যেমন, মধ্য এবং দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, বা দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী জাতিগোষ্ঠি )। এস্কিমোরা ঘরের বাইরে পোষাক পরলেও ঘরে ( বরফের ) ঢোকবার সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঘরে ঢোকে, এবং ভিতরে উলঙ্গ অবস্থাতেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে বসবাস করে *। Carlyle তাই রায় দিয়েছেন, "The first purpose of clothes···was not warmth or decency, but ornament"

আমাদের আলোচনা কিছুটা কেতাবী হলেও অন্তত এইজন্যই প্রয়োজনীয় যে পরিচ্ছদের সূত্রপাত এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় অনেকেই মনে করেন যে যুক্তি অথবা প্রয়োজনের তাগিদে পোষাকের চরিত্র বদলান যায়। এই ধারণাতেই অনেকে পোষাক সম্বন্ধে বিভিন্ন রায় দিয়ে বসেন। কেউ কেউ সমস্ত জাতির পোষাক হিসেবে কোন ইউনিফর্মের প্রচলন সুপারিশ করেন। কিন্তু পোষাককে এভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। জাতীয় পোষাক কখনই ফরমায়েসের উপর গড়ে উঠবে না।

পাশ্চাত্যপোষাকের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুইতরফেই প্রধান যুক্তি উপযোগিতা। একদল বলেন এ পোষাক আধুনিক কলকারখানা-অফিসকাছারীর উপযুক্ত, ট্রামে বাসে চলাফেরার জন্য অপরিহার্য। অন্যপক্ষ বলবেন আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আঁটসাট প্যান্টকোট আর গলাবন্ধটাই একান্ত অনুপযোগী এবং অস্বস্তিকর। এই নিয়ে বাদপ্রতিবাদের অর্থ হয় না। পোষাকের বিবর্ত্তনে যে উপযোগিতার প্রশ্ন খুব প্রাধান্য পায় না সেকথা আগেই আলোচিত। তবে পোষাককে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত না করা গেলেও ( অন্যান্য যে কোন বিষয়ের মত পোষাকও অবশ্য রাষ্ট্র থেকে আইনের বলে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিন্তু তা যে কাম্য নয় সে বিষয়ে সবাই একমত হবেন ), ফ্যাশানকে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব। সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ( জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা বা অভিনেতৃসহ ) এই ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ভূমিকা আছে। তাই প্রয়োজনবোধে এদের সক্রিয় সহযোগিতায় অবাঞ্ছনীয় প্রবণতা থেকে পোষাকের ফ্যাসানের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। পাশ্চাত্য পোষাক সম্বন্ধে অন্য কয়েকটি বিশেষভাবে ভাববার, এবং তার অবাঞ্ছনীয় দিক যদি এই ভাবে বর্জন করা যায় তবে সেদিকে রাষ্ট্র এবং সমাজ নেতাদের দৃষ্টি সঞ্চালন করতে হবে।

পাশ্চাত্যপোষাক, অর্থাৎ যে পোষাকে আমরা ইংরেজদের দেখে আসছি, এদেশের সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তির আয়ত্বের বাইরে। এই দারিদ্র্য চিরস্থায়ী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে না এবং সাধারণ পোষাকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপোষাকের বর্ত্তমান উচ্চ মূল্যমানও যে নাবিয়ে আনা যাবে না একথাও ঠিক নয়, কিন্তু পোষাকের মাধ্যমে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার মনোবৃত্তিকে

* (1) Robert Briffault এর Mothers. Vol III Chap xxvi দ্রষ্টব্য

(2) Havlock Ellis এর মতে "It is evident that in the beginning protection is too little or no extent the motive for attaching foreign substances to the body ( studies in the psychology of sex. 1923 )

যদি মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রবণতা বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে পাশ্চাত্যপোষাকের বিরুদ্ধতা অপরিহার্য, কারণ এই পোষাকের মূল্যমানের উচ্চতার সীমা অত্যধিক তাই এই পোষাকে ধনীদরিদ্রের অসাম্য যত ফোটে অন্যকোন পোষাকে তত নয়। আমাদের দেশ সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে এবং তাই যে কাম্য একথা যদি আমরা মেনে নেই তবে পাশ্চাত্য পোষাকের এই প্রবণতার দিকে চিন্তা করতেই হবে। যদি সাম্য আনতে হয় তবে ব্যায়সাধ্য পোষাককে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে। একথা ক্রমশ স্বীকৃত যে মনের উপর পরিচ্ছদের প্রভাব যথেষ্ট। তাছাড়া একদিকে যদি কে কত দামী পোষাক পড়তে পারে তার অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে তবে সমাজে কখনই সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের অনুকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাবে না, কারণ এই মনোভাব শুধু পরিচ্ছদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার প্রভাব সমাজের অন্যান্য স্তরেও বিস্তৃত হ'তে বাধ্য।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের আদর্শে গড়া শান্তিনিকেতনে প্রচলিত পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। শান্তিনিকেতনে কোনদিন কোন বিশেষ ধরনের পোষাক বেঁধে দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু সর্বভারতীর সংস্কৃতির এই মিলন ক্ষেত্রে পাজামা-পাঞ্জাবী চাদর সহ যে ধরনের পোষাক ছাত্রদের মধ্যে রেওয়াজে দাড়িয়েছে বাংলার অন্যত্র বিশেষত লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মী মহলে তার ছাপ পড়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হ'ল এই ধরনের পোষাকও আজকাল ফ্যাসনে দাড়িয়েছে।

আমাদের পোষাক কি জাতীয় হবে এ সম্বন্ধে ফরমান দেওয়া সম্ভবপর নয়। ফ্যাসন পরিচ্ছদের হেরফের নিয়ন্ত্রিত করে একথা ঠিক, কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে ফ্যাশনও সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া পোষাক পরিচ্ছদই হোক আর অন্য যে কোন সামাজিক অনুষঙ্গই হোক, একেবারে ঐতিহ্যবিমুক্ত ভাবে কোন কিছুই কায়েমী হয়ে বসতে পারে না। তাই আমাদের আগামী পরিচ্ছদ একদিকে যেমন দেশীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহী হবে, অন্যদিকে আবার যুগধর্মের প্রভাবেও কিছুটা রূপান্তরিত হতে বাধ্য। সবশেষে ফ্যাশনের প্রভাবকে অস্বীকার না করেও একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিতে বা ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিসর্বস্বতার আবহাওয়ায় ফ্যাশনের যে ধারার সঙ্গে পরিচিত, সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়ায় তার সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে যাওয়া কল্পনাতীত নয়।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

## সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

### সরকারী কলা মহাবিদ্যালয় ও চিত্রপ্রদর্শনী

সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনী দেখে এলাম। গত বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এ বছরের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সকলের জন্য খোলা ছিল।

প্রদর্শনীতে ঢুকেই ছবির প্রথম ঘরটি হলো চারুশিল্প বিভাগের। উল্লেখযোগ্য ছবির সংখ্যা খুবই কম। তেল রংএ আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণের ব্যবহারের নূন্যতাই প্রথম চোখে পড়ে। এরপরের ঘরটিতে ভারতীয় পদ্ধতি মেনে করা ছবি সংখ্যা মোটামুটি মধ্যম মানের। ফাইন আর্ট বিভাগের তেল রং ও জলরং এ আঁকা ছবিগুলিতে আন্তরিক অভিনিবেশের বেশ অভাব। তেল রংএর ছবিগুলিতে রং এর অক্ষম ব্যবহার, গঠন প্রণালীর মধ্যে গোঁজামিল দেবার চেষ্টা চোখে লাগে। আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের নয়। এই ছবিগুলিকে ঠিক কোন পর্য্যায়ে ফেলা যায় তা চিন্তার বিষয়, কেননা পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা ছবি হলেও, ঠিক পাশ্চাত্য রীতি অনুসরন করা হয়নি, কিম্বা আধুনিক ভারতীয় রীতিতেও এরা বিশ্বাসী নয়। এতে করে এইটাই মনে হলো যে রীতির দিক দিয়ে এরা পাশ্চাত্য Old masterদের ছবির গঠন পদ্ধতি, আর চমৎকার বর্ণক্ষেপন, কিংবা আধুনিক য়োরোপীয় শিল্পকলার আঙ্গিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। যাতে করে না ভারতীয় না আধুনিক দ্বিধার মধ্যে ছাত্রেরা কাল কাটাচ্ছে। সার্থক দৃষ্টির পথে এটা একটা প্রচণ্ড বাধা। ছাত্রদের আধুনিক রীতিতে অঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই জানান হয় না, কিংবা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের Old masterদের উদাহরণও অনুসরণ করতে বলা হয় না। যার জন্য এই কলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা আঠারো শতাব্দীর 'ইংলিশ' ধারার একটা অদ্ভুত প্রচেষ্টা করে চলেছে। এরা বোধহয় Colour blind, ছবিতে রং আছে, যা খুবই গাঢ়, আর সেই গাঢ় রং ছবিগুলোকে নোংরা বদ্ধ পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে। গোঁড়ামী ছেড়ে নতুনভাবে সমস্ত কিছু গ্রহন করাবার জন্যে মহাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত আর সেই সঙ্গে ছাত্রদেরও একটা উন্মুক্ত উদার শিল্প প্রচেষ্টার পথে এগিয়ে দেওয়া উচিত।

তবুও লিথোগ্রাফ, এচিং, কাঠখোদাই বিভাগে সুলেখা চ্যাটার্জির করা 'প্রসাধন' ( ২৬৩ ) একটু উল্লেখযোগ্য, কিংবা প্রভাতকুমার গাঙ্গুলীর ড্রাই পয়েন্ট এচিং ( ২৬৯ ) বেশ ভাল। এছাড়া সৌরেন রায়, বিনয় গুহ এরা কাজে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে।

ভারতীয় চিত্রবিভাগটি মোটামুটি মান বিশিষ্ট, তবে যামিনী রায় অবনীন্দ্রনাথ ধরণের অক্ষম কাজও প্রচুর। এখনও যেন আমরা কল্পলোকে বহুদিন গত শতাব্দীর বিষয়বস্তু আঁকড়ে ধরে আছি। প্রতিবছর একঘেয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচন চোখে বড় কটু লাগে। ছেলেদের এ জড়তা নিশ্চয়ই ত্যাগ করা উচিত।

সব থেকে বেশী প্রশংসা-পাবার যোগ্যতা এই মহাবিদ্যালয়ের Commercial art বা ব্যবহারিক শিল্প বিভাগটি রাখে। ব্যবহারিক শিল্প বিভাগে hording folder, window display, Calender প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারিক শিল্প বেশ উন্নত মানবিশিষ্ট। এই ধরণের কাজগুলি দেখলে মনে হয় যে এই বিভাগের ছাত্রেরা সত্যিই আন্তরিক অনুরাগ দিয়েই কাজ করে। এই বিভাগের মধ্যে বেণু লাহিড়ী, বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী, ঠাকুরপ্রসাদ বসু, জগদীশ ধর, বিপুল সেনগুপ্ত এঁরা সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। বিশেষতঃ বেণু লাহিড়ীর বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত ৩৯৯ নং টি গঠন প্রণালী, রংএর সার্থক ব্যবহারে জনসাধারণের মনে দাগ কাটতে পারে। ঠিক ব্যবহারিক শিল্প হিসাবে এটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর করা ক্যালেণ্ডার ৩৭৮ নং, এবং ৩৭৭ নং টি বেশ ভাল। বিভিন্ন প্রচ্ছদপটগুলোও একটা মান বিশিষ্ট। মহাবিদ্যালয়ের এই বিভাগটি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

এরপর Crafts বিভাগটিও কম আকর্ষণ করেনা। Crafts বিভাগের মধ্যে বাটিক, সিরামিক, কাঠের লেখনা প্রভৃতি নানা রকম চিত্তাকর্ষক বস্তু সকলকেই নিঃসন্দেহে আনন্দ দেবে। কাঠ খোদাই কাজে বিন্দুরাণী ভট্টাচার্য্যের বেশ নিপুণ হাতের পরিচয় পেলাম। কিংবা ওই খোদাইর কাজে বিনয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল ভট্টাচার্য্যও বেশ ভাল কাজ করেছেন। সর্ব্বাণী ঘোষের করা বাটিকের সাড়িটি বেশ পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং নিপুন কাজ। সঞ্চিতা সেনের সেরামিকের কাজও প্রশংসনীয়া সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের ব্যবহারিক ও Crafts বিভাগটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। এই দুইটি বিভাগের উপকারিতা ছাত্রেরা নিশ্চয় অনুভব করছে। এবং দুই বিভাগীয় কাজ উন্নত ধরণের। Fine art এবং Indian painting বিভাগে যাতে উন্নত ধরণের কাজে ছাত্রেরা মন দেয় সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**চিত্রিতা বিশ্বাস**

# গ্রন্থপরিচয়

**বনশ্রী : অশনি মজুমদার। কমলা বুক ডিপো। দুটাকা চারআনা।**

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, আধুনিক লেখকরা তার সার্থক উত্তরসূরী। একথা জোর করেই বলা যায় যে, আধুনিক লেখকরা এখন অনেক ছোটগল্প লিখেছেন যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে শুধু তাই নয়, একেবারে নবাগতদের লেখায়ও রীতিমত পাকা হাতের ছাপ পাওয়া যায়।

শ্রীঅশনি মজুমদার বাংলা সাহিত্যে নবাগত। 'বনশ্রী' তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ। কিন্তু এই প্রথম গ্রন্থেই তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

'বনশ্রী'র গল্পগুলি একটু অন্য জাতের। যাঁরা জমকালো কাহিনী কিম্বা ষ্টাণ্টের ভক্ত, এসব গল্প তাঁদের ভাল লাগবে না। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই মনের বিশেষ এক একটি অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখক শুধু ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গেছেন তার ফলে চরিত্র গুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমেরিকান লেখক আর্ণষ্ট হেমিংওয়ের ছোটগল্প এই জাতের। সে-কারণে সাধারণ পাঠক হেমিংওয়ের উপন্যাস যত পছন্দ করেন, ছোটগল্প তত নয়। হেমিং-ওয়ের উপন্যাসে রোমাঞ্চের স্পর্শ পাওয়া যায়, যা পড়ে সাধারণ পাঠক শিহরিত হন। কিন্তু ছোটগল্পে তিনি একেবারে ভিন্ন পথের পথিক। হেমিংওয়ের 'কিলার্স' পড়ে অনেককে বলতে শুনেছি—'কী আর এমন গল্প'। আমার এত বলার একমাত্র কারণ এই, যেহেতু শ্রীঅশনি মজুম-দারের ছোটগল্প এই শ্রেণীর সেহেতু তা পাঠক সাধারণের নিকট তেমন আবেদনশীল হবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পই আমার নিজের ভাল লেগেছে। একথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি। সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠ গল্প আমার মতে এই গুলি 'আহত', 'নমিতার সংসার', 'জোয়ার', 'প্রতীক্ষা', সমান্তরাল'।

লেখকের ভাষা সহজ—ছোটগল্পের সম্পূর্ণ উপযোগী। প্রকৃতি-বর্ণনা, মনোবিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধহস্ততার প্রমাণ গ্রন্থের যত্রতত্র ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

'বনশ্রী' প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। আশাকরি শ্রীঅশনি মজুমদারের পরবর্তী রচনায় তা আরো বিকশিত হবে।

পরিশেষে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের কোন মূল্য নেই। যে সব অখ্যাত লেখক বইয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে বিখ্যাত লেখকদের মন্তব্য ছাপেন, তারা আসলে কৃপার পাত্র। প্রতিশ্রুতিশীল লেখক হয়েও শ্রীমজুমদার সার্টিফিকেটের প্রত্যাশী, একথা জেনে আশ্চর্য লাগে বইকি।

**হীরেন বসু**

**বি—কেলাস : অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ৩৲টাকা।**

ডোরাকাটা জাঙিয়া-কুর্তা, একঘেঁয়ে প্রাচীর ও গারদ, ঘড়ির কাঁটায় মাপা দৈনন্দিন ছক্‌কাটা জীবন। লোহা ও পাথরের এই দৈত্যপুরীর মধ্যে কিন্তু ঘুমন্ত রাজকন্যা পড়ে আছে সোনার কাঠির অপেক্ষায়। অতীন্দ্রবাবুর কুশলী হাতে সে জেগে উঠেছে। অভিশপ্ত এক নরলোকের বিষাদঘন জীবনের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণী 'বি—কেলাস'। এ সব বর্ণনা শিল্পীর স্বস্তিবচন নয়, বল্মীক-ঢাকা মনুষ্যত্বের শুভ্রমূর্তির বন্দনা। দেশকর্মী মোহিত, খুনে-কয়েদী মুন্না সুনীল আতাউর—'বি-কেলাস' এমনি আরো নানা পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টা মানুষের রক্তঝরা কাহিনীর সঞ্চয়ন। 'বি-কেলাস' জেল! "দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করবার শিক্ষায় পারদর্শী ক'রে তোলে, মানবতার যা কিছু মাত্রা নিংড়ে ফেলে দেয়। জেল অপরাধী উৎপাদনের কারখানা, তার শিল্প-সৌকর্য্যের পরাকাষ্ঠা বি-কেলাস কয়েদী"। একবার পা ফসকে এখানে এসে পড়লেই হ'ল, তারপর সমাজ আর পুলিশের কল্যাণে সে জীবনভোর জেল-বিহঙ্গ!

লেখকের এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কেবল মনে হয়, তিনি আর একটু দর্শন আর পাণ্ডিত্যের কথা কম দিতেন, ভুলতে পারতেন সার্সি, সাইক্লপস, নীটশে, শপেনহয়ের—তাহলে পাঠক হিসেবে আরো খুশি হতাম। সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পারলে যে কোনো রচনাই সাহিত্য হয়, 'বি-কেলাস'ই তার একটি গৌরবময় উদাহরণ। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয়।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

**বাংলার স্ত্রী আচার : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সংকলিত ॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৷৹**

পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বিবাহের রীতিনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহিলার লেখা চারটি নিবন্ধের মনোজ্ঞ সংকলন এটি। বিধি ও নিষেধের দুই মলাটের মধ্যে আবদ্ধ স্ত্রী-আচার নামে সরল এই পীনাল কোড। বেদ-বেদান্তের পূর্বকাল থেকে এগুলি আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যুগ যুগ ধরে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে আমাদের সমাজ জীবন। বহুলাংশে অর্থহীন হলেও এই সব আচার অনুশাসনকে মাথা নীচু করে মেনে নিতে মধুরই লাগে। এর মাহাত্ম্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানেই।

প্রত্যেকটি রচনার বিন্যাস ও বর্ণনা ঝরঝরে, গল্পের সহজ ও স্বাভাবিক সুর ভেসে ওঠে পাতায় পাতায়। শেষভাগে 'বিবাহের গান' সংগ্রহটি পুস্তিকার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

একটা কথা। লেখিকা কলকাতা শহরকে ভৌগলিক অর্থে পশ্চিম বঙ্গ বলে ধরেছেন। কিন্তু লৌকিক আচার ভূগোলের সম্মান রক্ষা ক'রে গড়ে ওঠে না। 'পশ্চিম বঙ্গ' অংশের বিবরণ গঙ্গার পশ্চিম অঞ্চলের কথা ঠিক নয়। পূর্ববঙ্গের কথা যেমন দু'টি ভাগে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে পশ্চিম বঙ্গের আরো একটি অনুচ্ছেদ দিলে বইটি পূর্ণাঙ্গ হতো। প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ প্রশংসনীয়।

সন্বিৎশেখর মজুমদার

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৩, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩, হইতে প্রকাশিত ও ২ হ্যারিংটন লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।